সকল ধর্মের মর্মকথা সবার ঊর্ধ্বে মানবতা

সর্বধর্মীয় সম্প্রীতি সংলাপ
৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩
হোটেল ৭১ কনফারেন্স কক্ষ,
বিজয়নগর, ঢাকা।
আয়োজনে: হেযবুত তওহীদ

হালাল এবং পুষ্টি সমৃদ্ধ গোস্তের চাহিদা মেটাতে, প্রাকৃতিক উপায়ে গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প গ্রহণ করেছি আমরা। আমাদের খামারে পশুদের বিষাক্ত স্টেরয়েড ইনজেকশন দেয়া হয় না।

Mekdad & Mehrad Agro Farm

Branch Office: Village: Porkara, Post: Chashirhat, P.S: Sonaimuri, Dist: Noakhali, Bangladesh
Dhaka Office: 139/1, Tejkunipara, Tejgaon, Dhaka. Ph: 01722 221 345, 01889 280 061

বন্ধ হোক সহিংসতা
বন্ধ হোক প্রাণহানী
হুজুগ, গুজব আর রক্তপাত

শান্তির জন্য প্রয়োজনীয় আদর্শ চলে এসেছে।
আসুন ঐক্যবদ্ধ হয়ে শান্তিপূর্ণ সমাজ নির্মাণ করি।

হেযবুত তওহীদ
মানবতার কল্যাণে নিবেদিত
01711-00 50 25, 01670-17 46 43

শিশুর মানসিক বিকাশ নিয়ে আপনি সচেতন?

আপন
শিশু বিকাশ ফাউন্ডেশন

একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি শিশুদের নৈতিক শিক্ষা এবং অভিভাবকদের সচেতন করার লক্ষ্যে দেশজুড়ে স্কুলগুলোতে সেমিনার এবং প্রোগ্রামের আয়োজন করে যাচ্ছে–

সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম / সেমিনারে আগ্রহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
০১৭৮৭৬৮২০১০ এই নম্বরে যোগাযোগ করুন।

সুস্থ শিশু, সুরক্ষিত আগামী
APON

আপন | শিশু বিকাশ ফাউন্ডেশন
Assisting Parents and Our Nation

www.aponfoundationbd.com
facebook.com/aponshishu

মনোবিজ্ঞানী সুলতানা রাজিয়া
চেয়ারম্যান, আপন শিশু বিকাশ ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

সকল ধর্মের মর্মকথা সবার ঊর্ধ্বে মানবতা

সকল ধর্মের মর্মকথা - সবার উর্ধ্বে মানবতা

ডিসেম্বর ২০২৩। অগ্রহায়ণ ১৪৩০। জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৫

সর্বধর্মীয় সম্প্রীতি সংখ্যা

প্রকাশক

হেযবুত তওহীদ

সভাপতি

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

সম্পাদক

মো. রিয়াদুল হাসান

সম্পাদনা পরিষদ

আদিবা ইসলাম, হাসান মাহদি, ওবায়দুল হক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

সুয়াইবুল বান্না

সম্পাদকীয় যোগাযোগ

এস এম শামসুল হুদা

বাসা ৩, রোড ২০/এ, সেক্টর ১৪, উত্তরা, ঢাকা ১২৩০

ফোন: ০১৬৭০-১৭৪৬৪৩, ০১৭১১-০০৫০২৫, ০১৭১২-৪৩২৮৭৪

ইমেইল: hezbuttawheed1995@gmail.com

মুখবন্ধ

▪ এস এম শামসুল হুদা,
তথ্য সম্পাদক, হেযবুত তওহীদ।

আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি স্থাপনে প্রত্যয়ী হেযবুত তওহীদ

বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় চার হাজার ধর্মের অনুসারী রয়েছে। বহু প্রাচীন ভাষায় লিখিত আসমানি কেতাবও বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু সত্য হচ্ছে এটাই যে, আল্লাহ তাঁর এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-রসুলের মাধ্যমে একটি মাত্র ধর্ম, একটি মাত্র পথ, একটি মাত্র আদর্শ পাঠিয়েছেন। নবীগণের বিদায়ের পর ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও স্বার্থান্বেষী একদল মানুষ ধর্মগুলোর শিক্ষাকে বিকৃত করে ফেলায় এসেছেন নতুন নবী। অনেক মানুষ নতুন সেই নবীকে গ্রহণ করে শুদ্ধ পথে ফিরে এসেছে, অনেকে তা না করে স্বার্থপরবশ হয়ে বা অজ্ঞতাবশত নতুন নবীর বিরুদ্ধাচারণ করেছে; তারা পূর্বের ধর্মেই রয়ে গেছে। এভাবে বিশ্বজুড়ে নানা ধর্মমতের সৃষ্টি হয়েছে। এই সকল ধর্মমতের মানুষের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে মানবজাতিকে এক জাতিতে পরিণত করতে এসেছেন আখেরি নবী মোহাম্মদ (সা.)। তিনি এমন একটি জীবনব্যবস্থা প্রবর্তন করে গেছেন যেখানে সকল ধর্মের মানুষ ধর্মপালনের সর্বোচ্চ স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা লাভ করেছিল। তা সব ধর্মের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ শত্রুতা দূর করে সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল।

বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লালসা ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক ঘৃণাবিদ্বেষ বিশ্বকে একটি মহাযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। বহুদেশে সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের উপর বর্বর নির্যাতন নিপীড়ন চালাচ্ছে, দেশ থেকে উৎখাত করছে। প্রতিটি ধর্মকে অবলম্বন করেই কট্টরপন্থী জঙ্গি একটি গোষ্ঠী রয়েছে। তার নিজ ধর্মবিশ্বাসী মানুষের সমর্থন পাওয়ার জন্য অপর ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করে থাকে। পাশাপাশি স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও সাম্প্রদায়িক এই বিদ্বেষকে উস্কে দিয়ে পরিস্থিতিকে ভয়াবহ করে তুলছে। সংখ্যালঘুদের উপর হামলার বিরুদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শক্তিপ্রয়োগের পন্থাই বেশি ব্যবহৃত হয়। আক্রান্ত গোষ্ঠীকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য তাদের উপাসনালয়ে পাহারার ব্যবস্থা করা হয়, আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। কিন্তু এগুলো সবই সাময়িক উপশম মাত্র, সমস্যার সমাধান নয়।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা এই উপমহাদেশে Divide & Rule নীতির প্রয়োগ করে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে শত্রুতার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল যার প্রতিক্রিয়া আজও বিদ্যমান। একই কায়দায় তারা মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমান ও ইহুদিদের মধ্যে ৭৫ বছর যাবৎ চলমান দাঙ্গার বন্দোবস্ত করে রেখেছে। এমন পরিস্থিতিতে হেযবুত তওহীদ আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি স্থাপনের লক্ষ্যে বিশ্বনবীর

কর্মনীতি, কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে সকল ধর্মের প্রতিনিধি ও অনুসারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছে, তাদেরকে নিয়ে সহস্রাধিক সভা-সেমিনার করেছে। সেখানে সমগ্র মানবজাতি কীভাবে একজাতিতে পরিণত হতে পারে সে সূত্র তুলে ধরেছে হেযবুত তওহীদ। হেযবুত তওহীদ চেষ্টা করে যাচ্ছে প্রতিটি ধর্মের অনুসারীদেরকে একটি সাধারণ বিশ্বাস ও চিরন্তন ন্যায়-অন্যায়ের ধারণার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করতে; তাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করতে, তাদের ভিতরকার মানসিক দেওয়ালকে ভেঙে ফেলতে।

এ কাজ করতে গিয়ে হেযবুত তওহীদ বহু অপবাদের বোঝা মাথায় নিয়েছে, নির্যাতনের শিকার হয়েছে। "সকল ধর্মের মর্মকথা - সবার ঊর্ধ্বে মানবতা" এই চেতনাকে ধারণ করে হেযবুত তওহীদ যখন দেশজুড়ে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সম্মেলন চালিয়ে যাচ্ছিল তখন উগ্র, সাম্প্রদায়িক, গোড়াপন্থী গোষ্ঠীটি হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে জঘন্য অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। তারা মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে উসকে দিয়ে নোয়াখালীতে অবস্থিত হেযবুত তওহীদের এমাম জনাব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিমের বাড়িতে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছে। নির্মাণাধীন মসজিদকে গির্জা বলে গুজব রটিয়ে ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে। তাঁর বাড়িঘর লুটপাট ও ভস্মীভূত করেছে এবং দুইজন সদস্যকে প্রকাশ্য দিবালোকে জবাই করে হত্যা করেছে। সর্বধর্মীয় সম্প্রীতি স্থাপন করতে গিয়ে এভাবেই প্রাণের মাশুল দিয়েছে হেযবুত তওহীদ, কিন্তু কখনও পিছপা হয়নি। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শান্তিকামী সকল মানুষের সাথে এ লক্ষ্যে সভা-সমাবেশ চলছে।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে "উগ্রবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সময়ের দাবি"- শীর্ষক একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে হেযবুত তওহীদ। এতে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিবর্গ, সংগঠক, রাজনীতিক, শিক্ষাবিদ, লেখক ও সাংবাদিকগণ। হেযবুত তওহীদের নারী বিভাগ ও দৈনিক দেশেরপত্রের সম্পাদক রুফায়দাহ পন্নীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটির মূল প্রতিপাদ্য উপস্থাপন করেন হেযবুত তওহীদের এমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম। এরপর অতিথিবৃন্দ একে একে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মূল্যবান মতামত প্রদান করেন। তারা হেযবুত তওহীদের অতুলনীয় ত্যাগ ও দুঃসাহসী সংগ্রামকে সাধুবাদ জানিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উগ্রবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

এস এম শামসুল হুদা

সম্পাদক - তথ্য, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক যোগাযোগ বিভাগ
কেন্দ্রীয় কমিটি, হেযবুত তওহীদ

সূচিপত্র

গোলটেবিল বৈঠকের মূল প্রবন্ধ ০৬

বিশিষ্টজনদের বক্তব্যের চুম্বক অংশ..... ১০

অনুষ্ঠানে আরও যারা উপস্থিত ছিলেন ১৮

অনুষ্ঠানের কিছু স্থির চিত্র ২০

দেশজুড়ে সর্বধর্মীয় সম্প্রীতি স্থাপনের উদ্যোগ ২১

সনাতন ধর্ম ও ইসলাম ২৭

“উগ্রবাদ মোকাবেলার পথ তুলে ধরছে হেযবুত তওহীদ” ৩২

মদিনা সনদে এক জাতিসত্তা গঠনের শিক্ষা ৩৫

ধর্ম অবমাননার জবাবে ইসলামের শিক্ষা ৩৮

ইসলাম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ‘আসাবিয়াহ’ শেখায়নি ৪২

বঙ্গবন্ধু-নজরুলের চেতনা ও হেযবুত তওহীদ ৪৬

সকল মানুষ ভাই ভাই হতে বাধা কোথায়? ৪৯

রাজনৈতিক হানাহানি, ঔপনিবেশিক পাপের উত্তরাধিকার ৫৪

"উগ্রবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সময়ের দাবি"- শীর্ষক

গোলটেবিল বৈঠক

আয়োজনে: হেযবুত তওহীদ

স্থান: হোটেল ৭১, বিজয়নগর, ঢাকা। তারিখ: ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩, বিকেল ৩.০০ টা

গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিপাদ্য উপস্থাপন করছেন হেযবুত তওহীদের এমাম জনাব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম।

সম্মানিত সুধী। শুভ্র শরতের এই দিনে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত সকল অতিথিকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন, শুভেচ্ছা ও সালাম। আজকে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মুক্তভাবে কিছু কথা বলার জন্য আমরা একত্র হয়েছি। আমরা এই অনুষ্ঠানে তাদেরকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছি যাদের সম্মিলিত শুভচিন্তা জাতির অগ্রযাত্রায় ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

আমরা সকলেই সম্যক অবগত যে, বিগত শতাব্দীর দুটো বিশ্বযুদ্ধের দগদগে ঘা এখনও এ সভ্যতার পিঠে দৃশ্যমান। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ পরিণামে মৃত্যু বরণ করেছে ১৪ কোটি মানুষ। আহত, বিকলাঙ্গ, উদ্বাস্তুর কোনো হিসেব নেই। যুদ্ধপরবর্তী অভাব, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, মহামারীতে মারা গেছে আরো কয়েক কোটি মানুষ। এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি এড়াতে জন্ম দেওয়া হয়েছিল জাতিসংঘসহ অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থার। কিন্তু যুদ্ধ একদিনের জন্যও বন্ধ হয়নি। উইকিপিডিয়ার তথ্যমতে, ১৯০০ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত বিশ্বে ১০৮৫টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের মধ্য দিয়ে আবারও একটা ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি দুনিয়া শুনতে পাচ্ছে। যুদ্ধের পরিণামে সৃষ্ট বিভিন্ন সংকট, যেমন জ্বালানী সংকট, বিদ্যুৎসংকট, দ্রব্যমূল্য, বাণিজ্য অবরোধ ইত্যাদির প্রভাব আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকেও ঘিরে ধরেছে। তাদের যুদ্ধের ব্যয়ভার পরোক্ষভাবে আমাদেরকেও বহন করতে হচ্ছে।

১৯৭১ সালে লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে এ দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতার মূল দাবি ছিল এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যেখানে সাম্প্রদায়িকতা, উগ্রবাদ, ধর্মান্ধতা, জুলুম, নিপীড়ন থাকবে না, বাকস্বাধীনতাসহ অন্যান্য মানবাধিকার যেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে। যে স্বপ্ন বুকে ধারণ করে দেশটি স্বাধীন করেছেন এ দেশের কৃষক, শ্রমিক, পেশাজীবী, সৈনিক, ছাত্রজনতা আজ স্বাধীনতার ৫১ বছর পর আমরা পর্যালোচনা করে সে স্বপ্নের কতটুকু বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি? হ্যাঁ, এ কথা অনস্বীকার্য যে, আমরা অবকাঠামোগত, বস্তুগত উন্নয়ন অবশ্যই করে চলেছি। কিন্তু আমাদের দেশে স্বার্থের রাজনীতির যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা দীর্ঘকাল থেকে চলে আসছে, তা ক্রমান্বয়ে ভয়াল রূপ ধারণ করেছে। যদি এই হানাহানির রাজনীতি এখনই বন্ধ করা না হয়, তবে আমাদেরকেও সিরিয়া, লিবিয়া, পাকিস্তান, ইরাকের মত পরিণতি ভোগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, সাম্প্রদায়িকতা, রাজনীতিতে ধর্মের অপব্যবহার, ধর্মীয় উগ্রবাদের চাষাবাদই এ সমস্ত দেশগুলোকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গিয়েছিল।

আমাদের দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। একটি গোষ্ঠী ইসলামকে ব্যবহার করে অর্থনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার (ধর্মব্যবসা) করছে। তারা ধর্মকে অবলম্বন করে উগ্রতা, বাড়াবাড়ি, ধর্মান্ধতার চর্চা করছে। সুযোগ পেলেই ভিন্নমতের মানুষকে কাফের, মুরতাদ, মালাউন, ভারতের দালাল, ইসরাইলের দালাল, নাস্তিকের দালাল বলে ফতোয়াবাজি, উন্মাদনা সৃষ্টি করে বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে সেটাকে তওহীদী জনতার হামলা বলে চালিয়ে দিচ্ছে। এরা ধর্মপ্রাণ জনতার ঈমানী চেতনাকে হাইজ্যাক করে তা ভুল পথে চালিত করে নিজেদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ হাসিল করছে। ধর্মীয় সমাবেশে তারা উস্কানিমূলক, উগ্রবাদী, অযৌক্তিক, বিজ্ঞানবিরোধী, নারীবিদ্বেষী ফতোয়া ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টিকারী বক্তব্য প্রতিনিয়ত দিয়ে যাচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য এ দেশকে একটি অকার্যকর মোল্লাতান্ত্রিক উগ্রবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করা। সেক্যুলার রাজনৈতিক দলগুলোর অনেক নেতাও এ জাতীয় ধর্মীয় উগ্রতা ও সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার করে থাকেন। এই উদ্দেশ্যে দেশে বারবার সংখ্যালঘু শ্রেণির উপর নৃশংস হামলা চালানো হয়েছে, অনর্থক ধর্মীয় ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন করে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট, সঙ্গীতালয়, সরকারি অফিস, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, পিটিয়ে পুড়িয়ে মানুষ হত্যা করা হয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত আমাদের দেশে ২৪ হাজারের বেশি সাম্প্রদায়িক হামলা হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) পরিসংখ্যান বলছে, গত ৯ বছরে বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর ৩ হাজার ৬৭৯টি হামলা হয়েছে। একইভাবে ২০১২ সালে ফেসবুকে গুজব রটিয়ে রামুর ১২টি বৌদ্ধ বিহারে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে দুষ্কৃতিকারীরা। এদেশে উগ্রবাদীরা রাতের বেলায় ঢাকার গুলশানের মত এলাকায় হোটেলে বিদেশি নাগরিকসহ ২০ জন মানুষকে জবাই করে হত্যা করেছে। এ সমস্ত বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডকে তারা ইসলাম

ধর্মের নামে চালিয়ে দিচ্ছে। বলা বাহুল্য যে এ সকল কর্মকাণ্ড ইসলামের মূল শিক্ষা ও আদর্শের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সাংঘর্ষিক। পরিকল্পিতভাবে বিশ্বময় ইসলামবিদ্বেষ প্রচারের উদ্দেশ্যে এ ধরনের ঘটনা ঘটানো হয় যার প্রমাণ বারবার গণমাধ্যমে আপনারা দেখেছেন।

তাদের এ ধরনের উগ্রবাদী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে মাঠে ময়দানে সোচ্চার ভূমিকা রাখছে অরাজনৈতিক আন্দোলন হেযবুত তওহীদ। এজন্য তারা হেযবুত তওহীদকে টার্গেট করেছে। সারাদেশে সাড়ে চার শতাধিক স্থানে তারা এ আন্দোলনের সদস্যদের উপরে, তাদের বাড়িঘরে, আন্দোলনের কার্যালয়ে হামলা করেছে। সোনাইমুড়িতে হেযবুত তওহীদের এমামের বাড়িতে কমপক্ষে চারবার বড় ধরনের হামলা চালানো হয়েছে। ২০১৬ সালে সেখানে তাঁর বাড়ির আঙিনায় নির্মাণাধীন মসজিদকে গির্জা বলে গুজব রটিয়ে হামলা চালায় স্থানীয় ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠী। তারা সেখানে হেযবুত তওহীদের দুইজন সদস্যকে জবাই করে, হাত পায়ের রগ কেটে হত্যা করে, তাদের চোখ তুলে নেয়। তারপর তাদের শরীরে পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। কয়েকটি বাড়ি লুটপাট করে ভস্মীভূত করে দেয়।

আমরা বলছি, তাদের এ সকল 'মতবাদগত সন্ত্রাস'- (Terrorism caused by religious sentiments) কে যদি ইসলামের প্রকৃত আদর্শ দিয়ে ভুল প্রমাণিত না করা হয়, তাহলে তাদের দ্বারা ভ্রান্ত ধর্মীয় উগ্রবাদী গোঁড়াপন্থী মতবাদের বিস্তার ঘটবে, আরো বহু তরুণ তাদের দলভুক্ত হয়ে নিরীহ মানুষকে হত্যা করে, সংখ্যালঘুর উপর হামলা চালিয়ে ভাববে যে তারা ইসলামের বড় খেদমত করছে, ধর্মের জন্য জেহাদ করছে। উগ্রবাদীরা এ দেশকে বসবাসের অযোগ্য বানিয়ে ছাড়বে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছারখার করে দেবে, যাবতীয় অর্জনকে অর্থহীন করে দেবে।

বাংলাদেশে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, পাহাড়ী, সমতলবাসী সকলের সমান অধিকার রয়েছে এই মাটির উপরে। ইতিহাসের গোড়ায় যদি ফিরে যাই, যদি প্রধান কয়েকটি ধর্মগ্রন্থে দৃষ্টি রাখি, তাহলে দেখতে পাব আমরা সবাই একই পিতা-মাতার সন্তান, সমগ্র মানবজাতি এক জাতি। তাই ভাষা, বর্ণ, জন্মপরিচয়, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, ভৌগোলিক সীমানার দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম বিভাজন কোর'আন মোতাবেক নিষিদ্ধ। স্রষ্টা মানুষকে মাত্র দুটো ভাগে ভাগ করেছেন- ভালো ও মন্দ। মানুষের মর্যাদাও নির্ণিত হবে ভালো কাজ ও মন্দ কাজের ভিত্তিতে। এর বাইরে কোনোরূপ বংশীয় আভিজাত্য, অর্থ বা ক্ষমতার ভিত্তিতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ইসলাম স্বীকার করে না।

মানবজাতির জন্য স্রষ্টা যুগে যুগে একই ধর্মকে ভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষায় প্রেরণ করেছেন। স্রষ্টার প্রেরিত সম্ভবত প্রাচীনতম ঐশীগ্রন্থ হচ্ছে বেদ এবং সর্বশেষ গ্রন্থ কোর'আন। বেদে স্রষ্টা মানুষকে যে নির্দেশ দিয়েছেন- "হে মানবজাতি! তোমরা সম্মিলিতভাবে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হও, পারস্পরিক মমতা ও শুভেচ্ছা নিয়ে একত্রে পরিশ্রম কর, জীবনের আনন্দে সম অংশীদার হও। একটি চাকার শিকগুলো সমভাবে কেন্দ্রে মিলিত হলে যেমন গতিসঞ্চার হয়, তেমনি সাম্য-মৈত্রীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হও, তাহলেই অগ্রগতি অবধারিত। (অথর্ব্ববেদ, ৩/৩০/৬-৭)।

কালপরিক্রমায় ধর্মগুলো ভিন্ন পরিচয় ধারণ করলেও সেগুলোর মধ্যে অগণিত মিল রয়েছে। যেমন ইসলামের এক নাম দীনুল কাইয়্যেমা। শব্দটি এসেছে 'কায়েম' থেকে যার অর্থ শাশ্বত, সুপ্রতিষ্ঠিত, চিরন্তন, সনাতন জীবনব্যবস্থা। যে নীতি বা ধর্ম ছিল, আছে এবং থাকবে সেটাই হচ্ছে সনাতন বা কাইয়্যেমাহ। সনাতন, ইসলাম ও সেমেটিক প্রতিটি ধর্মই মনে করে ঈশ্বর বা পরমাত্মা এক ও অখণ্ড সত্তা। ইসলাম বলে- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ এক আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুমদাতা নেই। সনাতন ধর্ম বলে- একমেবাদ্বীতিয়ম, একমব্রহ্ম দ্বৈত্ব নাস্তি। যার অর্থ হচ্ছে- ব্রহ্ম একজন। তাঁর কোনো দ্বিতীয় নাই।

খ্রিষ্টধর্মেও একই কথা- There is only one Lawgiver and Judge. (New Testament: James 4:12). যিশুকে মুসলিমরা নবী বলে বিশ্বাস করেন। কোর'আনের নিরানব্বইটি আয়াতে ঈসা (আ.) এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁকে স্রষ্টা থেকে প্রাপ্ত 'পবিত্র আত্মার অধিকারী' বলা হয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা নিরিশ্বরবাদী হলেও তারা সকল ধর্মের মতই পরকালে বিশ্বাসী। বুদ্ধের জীবনী পাঠ করলে এটা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, তিনিও নবী-রসুলগণের মতই একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন। আমরা সেই সকল মহান শিক্ষকদের শিক্ষাকে অনুসরণ করে একত্রে পথ চলতে চাই।

এজন্য আমরা সমাজের বিভিন্ন স্তরে অবস্থানকারী সুধীজন, চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটা সমন্বিত কর্মসূচির প্রস্তাব করছি। উগ্রবাদীরা তাদের বইপত্রে, ওয়াজে, খোতবায়, সোশ্যাল মিডিয়ায় কোর'আন, হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা, বিকৃত ব্যাখ্যা, উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যা (Intentional explanation) দিচ্ছে। সাধারণ মানুষ তাদেরকে ইসলামের কর্তৃপক্ষ মনে করে অন্ধভাবে সেগুলোকে মেনে নিচ্ছে। এভাবে তারা ইসলামপ্রিয় মানুষকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করছে। তাদের কাছে ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরতে হবে যা আমাদের কাছে রয়েছে, যা অকাট্য, বিতর্কের ঊর্ধ্বে। বিশেষজ্ঞরা একেই বলেন Counter Ideology বা Counter Narrative. একটি ভুল মতবাদকে এভাবে সঠিক যুক্তিসঙ্গত দলিল প্রমাণ দিয়ে অপনোদন করার নাম আদর্শিক লড়াই বা Ideological War.

সরকার এ ধর্মীয় উন্মাদনা ও নৈরাজ্যসৃষ্টিকারীদের দমনের জন্য শক্তি প্রয়োগ করে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সরকারের হাতে আছে শক্তি, আইন, বুলেট। তারা তাদেরকে গ্রেফতার করছেন, রিমান্ডে নিচ্ছেন, জেল দিচ্ছেন। কিন্তু 'মতবাদগত সন্ত্রাস' নির্মূল করার জন্য 'মতবাদকে' নির্মূল করতে হয়। অন্যথায় এসব শক্তিপ্রয়োগের ফল হবে উল্টো। যত তারা বিচারের মুখোমুখি হবে, ততই তাদের 'ভ্রান্ত মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত' ধর্মীয় চেতনা বৃদ্ধি পাবে। জেলখানায় গিয়েও তারা এই ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করবে। কার্ল মার্কস ধর্মকে আফিম বলেছিলেন। কারণ এটা মানুষকে বুঁদ করে দেয়। তিনি যে বিকৃত ধর্ম দেখেছেন সে নিরিখে এ কথা বলেছেন। কিন্তু ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা আফিমের মত বুঁদ করে না, তা মানুষকে মানবকল্যাণের পথে সংগ্রামে জাগ্রত করে, উজ্জীবিত করে, বিপ্লবী করে।

হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা টাঙ্গাইলের প্রখ্যাত পন্নী পরিবারের সন্তান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। হাজার বছরের ইতিহাস বহনকারী এই পরিবারের সদস্যরা এককালে গৌড়ের স্বাধীন সুলতান ছিলেন। আসাম থেকে চট্টগ্রাম, ভারতের ঝাড়খণ্ড থেকে পুরি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাঁদের সালতানাত (Territory)। ব্রিটিশযুগে এই পরিবারের সদস্যরা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন করতে করতে নিঃস্বপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন। করটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী তথা চান মিয়া সাহেবের প্রতিষ্ঠিত বাংলার আলিগড়খ্যাত সা'দত কলেজ শিক্ষাবিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল।

হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এমামুয্যামান নিজেও ছিলেন একজন ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী, সমাজসেবী, রাজনীতিক, ক্রীড়াবিদ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক, চিকিৎসক, লেখক, দার্শনিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ। তিনি ২০০৯ সালে সরকারকে জঙ্গিবাদ নির্মূলে করণীয় প্রসঙ্গে লিখিতভাবে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আমরা মানুষকে উগ্রবাদ নির্মূলে ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টির লক্ষ্যে নিজেদের অর্থ খরচ করে এ যাবৎ কয়েক লক্ষ জনসচেতনতামূলক সভা সমাবেশ, সেমিনার ও মানববন্ধন করেছি, হ্যান্ডবিল, দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করে, বই পুস্তক লিখে এসকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি। এই কাজ করতে গিয়ে আমরা আমাদের জীবন বাজি রেখেছি। এর পেছনে আমাদের কোনো অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক স্বার্থ নেই, কারণ হেযবুত তওহীদ সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক আন্দোলন। তবে আমাদের এই প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে সমাজের সকল দেশপ্রেমিক, শান্তিপ্রিয়, নিঃস্বার্থ মানবকল্যাণকামী নাগরিককে যুক্ত করা গেলে তা একটি শক্তিশালী প্লাটফর্ম হয়ে দাঁড়াবে। সেখানে প্রত্যেকেই যার যার অবস্থান থেকে এই সংগ্রামে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবেন, পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করতে পারবেন।

আসুন আমরা সবাই স্বার্থের রাজনীতি, ধর্মব্যবসা, ধর্ম নিয়ে অপরাজনীতি, ধর্মীয় উগ্রবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আপোষহীন অবস্থান গ্রহণ করি। এতে করে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিরাপদ হবে, প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের মাটি অস্ত্রব্যবসায়ী পরাশক্তিধর রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রের কবল থেকে রক্ষা পাবে। এটা একাধারে আমাদের ধর্মীয় কর্তব্য এবং সামাজিক কর্তব্য। এখনও যদি আমরা দেশ ও জাতির স্বার্থে এসকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ না গড়ে তুলি তাহলে অনেক দেরি হয়ে যাবে, তখন আর হয়তো কিছুই করার থাকবে না।

আমাদের প্রস্তাবনা

১. ধর্মীয় উগ্রবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে একটি রেনেসাঁ সৃষ্টির জন্য যে আদর্শ ও শক্তিশালী বক্তব্য প্রয়োজন সেটা হেযবুত তওহীদের কাছে রয়েছে। কিন্তু আমাদের সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকায় অথবা কারো অপপ্রচারে প্রভাবিত হওয়ার দরুন অনেকেই আমাদের বিষয়ে ভুল ধারণা পোষণ করেন। হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে যাবতীয় অস্পষ্টতা ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে সকলকে মুক্ত হতে হবে।

২. আলোচনা সভার জন্য হল অথবা স্থান সহজলভ্য ও নিরাপদ করতে হবে। আমাদের সদস্যরা সবাই সাধারণ, তাদের পক্ষে ব্যয়বহুল অনুষ্ঠান করা সব সময় সম্ভব নয়। তাই আলোচনা অনুষ্ঠানের স্থান বা সরকারি হলরুম সহজলভ্য করতে হবে। জাতির কল্যাণে আমরা শুধু মসজিদ নয়, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডায় বা যে কোনো রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ে গিয়েও কথা বলতে প্রস্তুত আছি। এ জাতীয় স্থানগুলোকে সর্বধর্মীয় সম্প্রীতি সৃষ্টি সংক্রান্ত আলোচনা করার জন্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে সহযোগিতা কামনা করছি।

৩. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টি ও উগ্রবাদ মোকাবেলায় সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি প্রস্তাবনা সরকারের উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর অনুরোধ করছি।

৪. প্রত্যেক জেলায় এ ধরনের আলোচনা অনুষ্ঠান, সেমিনার ইত্যাদি করার জন্য হেযবুত তওহীদ প্রস্তুত রয়েছে। এজন্য সকল ধর্মীয় সংগঠনের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

৫. সর্বধর্মীয় সম্প্রীতি স্থাপনের লক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলোকে মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণার আওতায় আনতে হবে। এজন্য সকল ধর্মীয় সংগঠনের দায়িত্বশীলগণকে মুখ্য ভূমিকা পালন করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে-

(হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম)
এমাম, হেযবুত তওহীদ

প্রতিপাদ্য উপস্থাপন

- **হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম**
  এমাম, হেযবুত তওহীদ

সঞ্চালনা

- **রুফায়দাহ পন্নী**
  সম্পাদক, দৈনিক দেশেরপত্র

আলোচকমণ্ডলী

- **নির্মল রোজারিও**
  সভাপতি, বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ
- **এডভোকেট রানা দাশ গুপ্ত**
  প্রসিকিউটর, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ
- **মনীন্দ্র কুমার নাথ**
  যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ
- **অধ্যাপক ড. ফাজরিন হুদা**
  বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; পরিচালক, সেন্টার ফর ইন্টার রিলিজিয়াস অ্যান্ড ইন্টার কালচারাল ডায়লগ
- **মমতাজ লতিফ**
  লেখক ও কলামিস্ট
- **থিওফিল রোজারিও**
  আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশন
- **ডা. মামুন আল মাহতাব**
  সাধারণ সম্পাদক, সম্প্রীতি বাংলাদেশ
- **রফিকুর রশিদ**
  কথা সাহিত্যিক
- **কবির চৌধুরী তন্ময়**
  প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ অনলাইন এক্টিভিস্ট ফোরাম
- **সৌমিত্র দেব**
  সাংবাদিক ও কবি
- **এস এম শামসুল হুদা**
  সম্পাদক, দৈনিক বজ্রশক্তি ও তথ্য বিভাগ, হেযবুত তওহীদ
- **হুমায়ূন কবির ঢালি**
  শিশু সাহিত্যিক
- **রাজেন্দ্র চন্দ্র দেব মন্টু**
  সহ-সভাপতি, ঢাকা সাংবাদিক পরিবার
  বহুমুখী সমবায় সমিতি
- **ড্যানিয়েল নির্মল ডি কস্টা**
  প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ খ্রিস্টান মহাজোট

বিশিষ্টজনদের বক্তব্যের চুম্বক অংশ

সুপারিশ-

- ☑ দলের নাম আরবি ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষায় রাখা হলে অনেক বিড়ম্বনা ও ভুল বোঝাবুঝির অবসান হতে পারে।
- ☑ বাংলাদেশ সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীতে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতি দেওয়ার কারণে আমাদের দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি চরমভাবে বিনষ্ট হয়েছে। তাই ৭২ এর সংবিধানে ফিরে যাওয়ার জন্য জোর আন্দোলন করতে হবে।
- ☑ জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে হেযবুত তওহীদের আদর্শকে চর্চা করতে হলে আন্দোলনের রাজনৈতিক রূপরেখা সুস্পষ্ট করতে হবে।
- ☑ শুধু সরকারের কাছে দাবি দাওয়া পেশ না করে পারিবারিকভাবে সন্তানদেরকে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় শিক্ষিত করতে হবে।
- ☑ মানুষের ঘরে ঘরে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ছড়িয়ে দিতে হবে। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে হবে।
- ☑ পাঠ্যসূচিতে নিজ ধর্মের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মকে জানার ব্যবস্থা করলে অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ কমবে।
- ☑ প্রতিটি গ্রামকে একটা 'স্মার্ট গ্রাম' হিসাবে গড়ে তুলতে পারলে দেশকেও অসাম্প্রদায়িক স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলা যাবে।
- ☑ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের এক সুরে কথা বলতে হবে।
- ☑ উগ্রবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা দূর করার জন্য সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটানোর লক্ষে বেশি বেশি যাত্রাপালা, সাঁতার প্রতিযোগিতা, সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা প্রয়োজন। হেযবুত তওহীদ উদীচী, শতদলের মত সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারে।
- ☑ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অসাম্প্রদায়িক চেতনার মানুষদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।
- ☑ সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার রক্ষায় কাজ করে যেতে হবে।

▪ নির্মল রোজারিও

সভাপতি, বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ

হেযবুত তওহীদ দীর্ঘদিন থেকে সকল ধর্মের মানুষদের নিয়ে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ভুলে সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ে তুলতে কাজ করে আসছে। সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে কাজ করতে গিয়ে আন্দোলনটি বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও সকল ধর্মের মূল প্রতিপাদ্য মানবতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সাথে আমি একমত। আমরাও এই লক্ষ্যেই কাজ করছি। সঠিক সময়ে সাহসী উদ্যোগ ও উচ্চারণের জন্য আমি সেলিম সাহেব ও তার টিমকে ধন্যবাদ ও সাধুবাদ জানাই। এটা অত্যন্ত সাহসী কাজ যা সবার করা উচিত। কিন্তু সবাই পারে না। আপনি দাঁড়িয়েছেন। এটা না করলে ৭১' এর শহীদানদের রক্ত, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারীদের রক্ত বৃথা যাবে। হামলা-মামলা নানা প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে সত্যের পক্ষে এমন শক্ত অবস্থান সত্যিই প্রশংসনীয়। আজকে শক্তভাবেই দাঁড়াতে হবে। যদি আজ আমরা দাঁড়াতে না পারি তবে সামনে ভয়ানক পরিস্থিতি আসবে। তার দায় আমরা এড়াতে পারব না।

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা যে অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ পেয়েছিলাম তা ভোটের রাজনীতিতে ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে সাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে পরিণত হচ্ছে; কথা ছিল আমাদের মূলমন্ত্র হবে- ধর্ম কোনো বিষয় না, বড় পরিচয় আমরা মানুষ। বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীর সাথে রাষ্ট্রের আপস করে চলার দরুন মানবতা আজ বিপন্ন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ধর্মের মানুষদের সাথে নিয়ে সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্রকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

▪ এড. রানা দাশগুপ্ত

প্রসিকিউটর, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ

যখন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউটর হিসেবে দায়িত্ব নিতে আমাকে ডাকা হলো, আমি ভাবলাম, আমি তো আরেকবার মুক্তিযুদ্ধ করতে যাচ্ছি। কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে, আমি কি ওটাকে আর সেইভাবে ভাবতে পারছি? আমি যদি দেখতাম, একদিকে তাদের বিচার হচ্ছে, ফাঁসি হচ্ছে, অন্যদিকে জনগণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উন্মাতাল, তাহলে আজকে হেযবুত তওহীদকে এই দাবি নিয়ে মাঠে নামতে হতো না। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা চাপ সৃষ্টি করে রাষ্ট্র এবং রাজনীতিকে আদর্শিকতার জায়গায় আনতে না পারব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যাই বলি, ওই মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে আর দেখতে পাব না। এখন হচ্ছে কী? রাষ্ট্র আমাকে নাগরিক হিসেবে না, বরং হিন্দু হিসেবে, বৌদ্ধ হিসেবে, খ্রিস্টান হিসেবে পরিচিত করার চেষ্টা করছে। এর জন্য তো আমরা মুক্তিযুদ্ধ করি নাই।

পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের পর পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর হার ছিল ২৯.৭ শতাংশ। সত্তরের নির্বাচনের আগে এই হার কমে হয়ে গেল ১৯-২০ শতাংশ। ২০১১ সালে সংখ্যালঘুদের হার ১১ শতাংশে নেমে এলো। কিছুদিন আগে পরিসংখ্যান ব্যুরো দিলো, এই সংখ্যা বর্তমানে ৯.১ শতাংশ। ডক্টর আবুল বারাকাত বললেন, এই ধারা যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে আগামী দুই দশক পর বাংলাদেশে আর কোনো সংখ্যালঘুকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য হেযবুত তওহীদকে ধন্যবাদ জানাই। এখানে যে বক্তারা নিজেদের অবস্থান থেকে মূল্যবান বক্তব্য দিয়েছেন তাদেরকে জানাই সাধুবাদ।

▪ অধ্যাপক ড. ফাজরিন হুদা

পরিচালক, সেন্টার ফর ইন্টার-রিলিজিয়াস অ্যান্ড ইন্টার-কালচারাল ডায়লগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. ফাজরিন হুদা বলেন, আমরা উগ্রবাদীতার সাথে কম্প্রোমাইজ করছি। আমরা প্রতিবাদ করতে ভয় পাই। তার ফল হচ্ছে, বিশ্বজুড়ে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উত্থান। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশেও সাম্প্রদায়িকতার চাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেলিম সাহেব সাহসী ভূমিকা নিয়েছেন এবং তিনি যেভাবে শক্তভাবে দাঁড়িয়েছেন তা প্রশংসার দাবিদার। একটা সময় ধর্ম বলতে বুঝতাম- নামায, রোজা, পুজা-পার্বণ। ধর্ম যে জ্ঞানের বিরাট এক শাখা, ধর্ম যে আরেক মহাবিজ্ঞান তা জানতাম না। জানব কি করে? আমরা ধর্ম শিখি অশিক্ষিত হুজুরদের কাছে। কোর'আন সুন্নার শিক্ষা দেয়ার যোগ্যতা তাদের কতটুকু আছে? তারা শেখায় ঘৃণা। তাদের ধর্মের মূল শিক্ষাই হচ্ছে অন্যধর্মের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা। নির্দিষ্ট একটা গোষ্ঠীর কাছে কোর'আন-সুন্নার ব্যাখ্যা সীমাবদ্ধ রাখা একটি বড় সমস্যা।

সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতা ও সম্প্রীতি বাড়াতে পাঠ্যসূচিতে নিজ ধর্মের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মকে জানার ব্যবস্থা করা জরুরি। সবাই সবার ধর্ম সম্পর্কে জানলে অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ কমে যাবে। সবাই জানতে পারবে যে, সব ধর্মই মানবতার কথা বলে। এই শিক্ষা যেমন পরিবার থেকে দিতে হবে তেমনি শিক্ষাব্যবস্থায়ও থাকতে হবে। সিলেবাসে সকল ধর্মের শিক্ষাই ইনক্লুড করতে হবে। ব্যাপকভাবে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা দরকার। এতে মানুষের মধ্যে জন্ম নেওয়া উগ্রতা কমবে।

▪ কবির চৌধুরী তন্ময়

প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ অনলাইন এক্টিভিস্ট ফোরাম

আজকের প্রতিপাদ্য বিষয় অত্যন্ত সময়োপযোগী। মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কীভাবে প্রবেশ করেছে আজ সেটা পর্যালোচনা করার সময় এসেছে। গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি থেকে শুরু করে অবকাঠামোগত উন্নয়ন যেভাবে হয়েছে সে তুলনায় মানুষের মনোজগতের উন্নয়ন কি হয়েছে? সেটা মূল্যায়নের সময় এসেছে।

অত্যন্ত দুখঃজনক বিষয় হচ্ছে আজকে একটা শ্রেণি বিশেষ করে যারা স্বাধীনতাবিরোধী তারা ধর্মকে ব্যবহার করে দেশের সহজ সরল সাধারণ জনগোষ্ঠিকে ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে তাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রবিরোধী সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড ঘটানোর অপচেষ্টা করছে। আর তাদের উপস্থাপিত অপব্যাখ্যার সঠিক ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য যখন সেলিম সাহেবদের মতো মানুষ এগিয়ে আসেন তখন তাদের বিরুদ্ধে শুরু হয় ফতোয়ার বাণ। এমনকি এইসব মৌলবাদীদের কথায় প্রভাবিত হয়ে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গও তাদের সুরে সুর মেলায়। আবার আমরা যারা মানবতার পক্ষে কথা বলি তখন আমাদেরকে বলা হয় নাস্তিক, মুর্তাদ, কাফের ইত্যাদি।

সেলিম সাহেবের ফেসবুক পেইজে আমি দেখেছি কি অশ্লীল ভাষায় তাকে গালিগালাজ করা হচ্ছে। ৬৫টা কওমী মাদ্রাসা ভিজিট করার পরে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে, ছোট থেকেই যেসব ছেলেরা যাকাত ফিতরার টাকার উপর নির্ভর করে বড় হয় তাদের কাছ থেকে আসলে সভ্যতা, মানবতা, ব্যক্তিত্ব আশা করা যায় না।

▪ মনীন্দ্র কুমার নাথ

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ

সেলিম সাহেবের 'স্মার্ট গ্রাম' প্রজেক্টের ডকুমেন্টারি দেখে আমি মুগ্ধ। সমাজকে পাল্টে দেয়ার মতো একটি চিত্র আমরা দেখেছি। যদি সত্যি সত্যিই একটি গ্রামের চিত্র এভাবে পাল্টানো যায় তাহলে আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি আমাদের এই দেশ, আমাদের প্রিয় জন্মভূমির চিত্রও পাল্টানো সম্ভব হবে। আমাদের সমাজে যেভাবে মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক অবক্ষয়, অপরাজনীতি, অপসংস্কৃতি, ধর্মীয় অন্ধত্ব, ধর্মব্যবসা, জঙ্গিবাদ, মাদক, দুর্নীতি বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে এগুলোকে রুখতে হলে আমাদেরকে এভাবেই প্রথমে গ্রামীণ পরিবেশ থেকে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করতে হবে। উক্ত ভিডিও চিত্র দেখে আমার কাছে মনে হয়েছে এভাবে যদি একটা গ্রামের সকলে একত্রিত হয়ে নিঃস্বার্থভাবে একই লক্ষ্যে উন্নয়নের পথে এগুনো যায় তাহলে আমাদের এই দেশ আসলেই একদিন বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হবে।

আমাদের সমাজে সাম্প্রদায়িকতা, উগ্রবাদ, অপসংস্কৃতির বিস্তার বেড়েছে। যে কারণে বর্তমানে একটা বিষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, আমাদের দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হবে। এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় বের করতে হবে। এজন্য ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে সম্প্রীতি রক্ষায় সবাইকে একত্রে কাজ করতে হবে।

▪ মমতাজ লতিফ

লেখক ও কলামিস্ট

সেলিম সাহেব যে বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করছেন– এই পথ যে কতটা কণ্টকাকীর্ণ তা আমি জানি। তিনি হামলার শিকার হবেন এটা জানা কথা। সাম্প্রদায়িকতা নিরসনে আমিও কাজ করছি। জঙ্গিরা চিঠি দিয়ে আমাকে হুমকি দেয়। আমিও তার কড়া জবাব দিই। ভয় পেলেই ওরা পেয়ে বসবে। মানুষকে বেশি মানবতাবাদী করে সংস্কৃতি। সব ধর্মের মানুষদের নিয়ে যাত্রা, কবিগান, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড করলে সাম্প্রদায়িকতা কমানো সম্ভব।

দেশের থানা, জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন আছে। যেমন- উদীচী, মহিলা পরিষদ, খেলাঘর, কচিকাচার মেলা ইত্যাদি। এই সংগঠনগুলোকে সাথে নিয়ে হেযবুত তওহীদ প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করতে পারে। এসব অনুষ্ঠানে ছোটদের নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কারণ ছোটবেলায় বাচ্চাদের মাথায় যে বিষয়গুলো ঢুকে যায় সেটা আর সহজে বের হয় না। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, গানের প্রতিযোগিতা করা যেতে পারে। বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এতে করে সকলের মধ্যে উৎসাহ বাড়বে। এছাড়াও সকল মানুষকে নিয়ে নৌকাবাইচসহ দেশীয় বিভিন্ন খেলাধুলার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

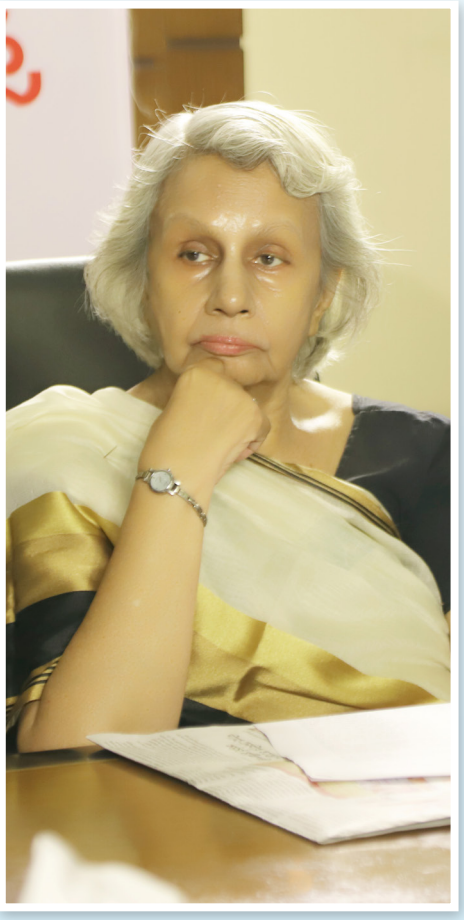

▪ ড্যানিয়েল নির্মল ডি কস্টা

প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ খ্রিস্টান মহাজোট

বাহাত্তরের সংবিধানের মূলনীতি ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতা। কিন্তু পরবর্তীতে সংশোধন করে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, আবার পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষতার কথাও বলবৎ রাখা হয়েছে। একই সংবিধানে দুই রকম নীতি, স্ববিরোধী নীতি। আমরা যারা অসাম্প্রদায়িকতার কথা বলি, মানবতার কথা বলি, দেশকে এগিয়ে নেয়ার কথা বলি, আমরাই সবাই এসব বিষয়ে ঐকমত্যে আসতে পারি না। আমরা নিজেদের 'কমন ইন্টারেস্ট' নিয়ে কথা বললেও, নিজের স্বার্থের বাইরে গিয়ে অন্যের জন্য কথা বলতে চাই না। এই অবস্থান থেকে বের হতে হবে। আমাদের আরেকটি দুর্বলতা হচ্ছে, আমরা এরকম শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে কথা বললেও আমাদের এই চেষ্টাকে প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে দিচ্ছি না। দেখা যাবে, হেযবুত তওহীদের উদ্যোগে আজকে যে চমৎকার অনুষ্ঠানটি হলো, তা শেষ হওয়ার পর সাম্প্রদায়িক শক্তি উঠেপড়ে লাগবে যেন ভবিষ্যতে এরকম অনুষ্ঠান আর করতে না পারে। আর আমরা যারা চাই এরকম অনুষ্ঠান আরো হোক, আমরা কিন্তু চুপ করে থাকবো। আমাদের এখান থেকেও বের হতে হবে।

আর আমাদের যে সংগঠনগুলো আছে, আমরা যারা মানবতার কথা বলছি, অসাম্প্রদায়িক চেতনার কথা বলছি, আমাদের নিজেদের মধ্যে কোনো বিভাজন, কোন্দল জিঁইয়ে রাখা যাবে না। আর আমাদেরকে কমন ইন্টারেস্টের উর্ধ্বে ওঠে প্রতিটি বিষয় নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। যে ঐক্যের কথা বলা হচ্ছে, তা একেবারে তৃণমূল থেকে শুরু করতে হবে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আমাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে, আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোতেও আমাদেরকে কাজ করে যেতে হবে।

▪ হুমায়ুন কবির ঢালী

শিশু সাহিত্যিক

যারা সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী, তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে শুরু করে প্রতিটি পাড়া মহল্লায় তাদের বক্তব্য প্রচার করছে। আমার মা একদিন রাতে বাইরে গেলেন। আমাকে বললেন, তালিমে যাচ্ছেন, সেখানে ধর্মের কথা হবে, ইসলামের কথা হবে। কিন্তু পরে জানতে পারলাম, সেখানে রাজনৈতিক বক্তব্য দেয়া হয়েছে। এভাবে ধর্মের কথা বলে পাড়ায় পাড়ায় গ্রামের সহজ-সরল মানুষকে ধর্মীয় রাজনীতির সবক দেয়া হচ্ছে। আর আমরা যারা অসাম্প্রদায়িকতার কথা বলছি, আমরা শুধু প্রেসক্লাবে বসে, এখানে ওখানে বসে নিজেদের মূল্যবান মতামত দিয়ে যাচ্ছি, বৈঠক শেষে বের হয়ে নিজেরাই সব ভুলে যাচ্ছি। কিন্তু এভাবে পরিবর্তন আসবে না। পরিবর্তন শুরু করতে হবে ঘরে ঘরে। আমাদের সন্তানদেরকে শিক্ষা দিতে হবে, ধর্ম মানো, কিন্তু ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। আমি একজন মুসলিম হিসেবে আমার সন্তানকে এই শিক্ষাটাই দিয়ে যাচ্ছি যে, নামাজ পড়ো, সত্য কথা বলো, অন্যায় করো না, অপরের ক্ষতি করো না। কেউ অন্য ধর্মের হলে তার সাথে বন্ধুত্ব করবে না, কথা বলবে না, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে– এটা ধর্মের শিক্ষা নয়। এই কথাটা আমার শিশু সন্তানদেরকে যেভাবে আমি বলছি, প্রত্যেক অভিভাবককে এই কাজটি করতে হবে। তারা তাদের সন্তানদেরকে কিন্তু ঠিকই শেখাচ্ছে, অন্য ধর্মের বাচ্চাদের সাথে কথা বলবে না, ক্লাসে তাদের সাথে বসবে না। আমরা যতক্ষণ ওই ঘর থেকে শুরু না করে কেবল গোলটেবিল বৈঠক করে যাব, ততদিন অবস্থার কোনো পরিবর্তন আসবে না।

▪ ডা. মামুন আল মাহতাব

সাধারণ সম্পাদক, সম্প্রীতি বাংলাদেশ

আজকে দেশে অনেক ধর্মভিত্তিক দল রয়েছে, কিন্তু ঐক্যের প্রশ্নে আমরা জানি যে তারা সবাই এক। অপরদিকে আমরা বুদ্ধিজীবীরা যদি একটা বৈঠকে বিশজন বসে থাকি তাহলে বিশ জনে বিশ রকমের মন্তব্য দেই। আমাদেরকে এই জায়গাটা থেকে চিন্তা করতে হবে। বুদ্ধিজীবীদের এক সুরে কথা বলতে হবে।

আজকে বাংলাদেশের একটি সমস্যা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সঙ্কট। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান নতুন কিছু নয়। পাকিস্তান আমলেই যে সাম্প্রদায়িক শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছে তাও নয়। মূলত যেদিন বঙ্গভঙ্গের দাবি তোলা হয়েছিল সেদিনই দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে সাম্প্রদায়িকতার যাত্রা শুরু হয়েছিল ব্রিটিশদের হাত ধরে। আমাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে, মুসলমান ও হিন্দু আলাদা। আমাদের মধ্যে বিভেদের বীজ ঢুকিয়ে দিয়েছে ব্রিটিশরাই। যখন ব্রিটিশরা ঔপনিবেশিক শাসন থেকে হটেছিল তখন তারা দেশকে ভাগ করেছিল ধর্মের উপর ভিত্তি করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীতে অনেক ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের উত্থান হয়েছে। তবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল এর বিরুদ্ধে চলার জন্য। একাত্তরে বাংলার স্বাধীনতা সেই সবের ধারাবাহিকতা নয়।

▪ রফিকুর রশীদ

কথা সাহিত্যিক (বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত)

সত্যিই বলছি, অসম্ভব ভালো লাগে এই মানুষটার (হেযবুত তওহীদের এমাম) কথা শুনলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শুনতে মন চায়। মনে হয় যেন নতুন করে শক্তি পাচ্ছি, উদ্যম পাচ্ছি। তিনি বারবার বলেছেন, যারা জঙ্গিবাদী তাদের ভাষ্যমতে তারা শহীদ হতে চায়। তাই বন্দুক দিয়ে, শাস্তি দিয়ে তাদেরকে রোধ করা যাচ্ছে না। তাই আদর্শিক শক্তির উত্থান তিনি কামনা করছেন।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও আমরা বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যেতে পারছি না। যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানের পেট থেকে বের হয়েছিলাম আজও আমরা অর্জন করতে পারি নি। রঙ-বেরঙের নানা ছদ্মবেশের মধ্য দিয়ে সেই সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পের ছোবলের শিকার হচ্ছি। এই ছোবল খাওয়ার পর কেউ কেউ উঠে দাঁড়াতে পারেন তার আত্মিক স্পিরিটের কারণে। কিন্তু এই স্পিরিটটি সবার সমান নয়, যে কারণে প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ একটি প্লাটফর্ম। আমরা এখানে যারা আছি, তারা প্রত্যেকেই কিন্তু এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে কথা বলছি, কিন্তু যার যার ফোরাম থেকে। যার যার এই ফোরাম থাকুক, তথাপি আমাদের কণ্ঠগুলো একটি জায়গায় এসে মিলতে হবে।

আজকে সাম্প্রদায়িক চেতনার বিপরীতে যে আদর্শিক শক্তির উত্থানের কথা বলা হচ্ছে, সেই উত্থানটি একটি সংঘবদ্ধ, ঐক্যবদ্ধ জায়গা থেকে হতে হবে, তার একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা থাকতে হবে। আমাদের লক্ষ্য যদি এক হয়, তাহলে কণ্ঠও এক হতে হবে।

▪ রাজেন্দ্র চন্দ্র দেব মন্টু

সহ-সভাপতি, ঢাকা সাংবাদিক পরিবার বহুমুখী সমবায় সমিতি

বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, আমি মানুষ, আমি বাঙ্গালি, আমি মুসলমান। ধর্ম পরিচয় আগে নয়, তিনি বাঙ্গালি পরিচয়কে আগে নিয়ে এসেছেন। ১৯৭১ সালে আমি নবম শ্রেণির ছাত্র ছিলাম। ওই বয়সে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। ওই সময় আমিও আমার ধর্মপরিচয় ভুলে গিয়েছিলাম। শুধু এটা মনে রেখেছিলাম, আমি বাঙ্গালি। বাঙ্গালি জাতি নির্যাতিত, শোষিত, নিপীড়িত, তাই জাতির মুক্তির জন্য আমাকে সংগ্রাম করতে হবে, এই একটা চেতনা নিয়েই বাড়ি থেকে পালিয়ে যুদ্ধে গিয়েছিলাম।

'সকল ধর্মের মর্মকথা, সবার ঊর্ধ্বে মানবতা', অর্থাৎ একটি অসাম্প্রদায়িক স্লোগান, মানবতার স্লোগান, এমন একটি বিশ্বাস ও চেতনা থেকেই কিন্তু আমরা মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম। আজকে এই গোলটেবিল বৈঠকে আমরা যে দাবি তুলেছি, তা সেই একাত্তর থেকে, তারও আগে বায়ান্ন থেকে শুরু হয়েছে। কিন্তু নানা কারণে আমাদের সেই স্বপ্ন আজও পূর্ণ হয় নি। আজকে হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম যে উদ্যোগ নিয়েছেন, একজন বাঙ্গালি হিসেবে, একজন মানুষ হিসেবে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমাদের প্রতিটি অঙ্গন থেকে যদি এভাবে একজন করেও দাঁড়াতেন, তাহলে বঙ্গবন্ধুর সেই সোনার বাংলা গড়তে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হতো না। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এই আদর্শিক সংগ্রামে আমরা সবসময় আপনাদের পাশে থাকবো। আমার আহ্বান থাকবে, এদেশে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও অপরাজনীতির বিরুদ্ধে আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আওয়াজ তুলি।

▪ সৌমিত্র দেব

সাংবাদিক ও কবি

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন, 'মুর্খরা সব শোন- মানুষ এনেছে গ্রন্থ; গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনও'। কবির এই চরণের শিক্ষা কি? ধর্মের নামে বর্তমানে বাইরে লেবাস ধারণ করা হয়। কিন্তু আড়ালে থাকে নোংরামী, দুর্নীতি, জুলুম। তবে সবাইকে ঢালাওভাবে দোষারোপ করা যাবে না, ধর্ম পরিচয় দিয়ে ভালো মন্দ নির্ধারণ করা যাবে না। আমরা যখন অসাম্প্রদায়িক চেতনার কথা বলি তখন অনেকেই এই কথাটি ভুলে যাই যে, এ দেশে বিশেষ কোনো ধর্মের মানুষ নির্যাতিত নয়, বরং সকল ধর্মের মানুষই নির্যাতিত। এই দেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানরা যেমন নির্যাতিত, তেমনি মুসলিমদেরও অনেকেই নির্যাতিত।

হেযবুত তওহীদ হিন্দুদের সংগঠন নয়, বরং মুসলিমদেরই সংগঠন। তবু ভিন্ন মত পোষণ করার কারণে তাদের উপরেও বারবার হামলা করা হয়েছে, এমনকি তাদের সদস্যদেরকে হত্যাও করা হয়েছে। সুতরাং এদেশে শুধু ধর্মীয় পরিচয় দিয়ে মানুষ নির্যাতিত হচ্ছে, এই চিন্তা মাথায় রেখে আমরা অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠন করতে পারব না। তাই সকলের প্রতি ভালোবাসা, সকলের প্রতি সহমর্মিতা, এই বোধ থেকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সকলের স্বার্থেই বাংলাদেশকে একটি মানবিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তার জন্য একটি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম প্রয়োজন। আমি মনে করি, হেযবুত তওহীদ আমাদের জন্য সেই প্লাটফর্মটি তৈরি করে দিয়েছে। যাকে আমরা সানন্দে স্বাগত জানাই।

▪ মিস্টার থিওফিল রোজারিও

আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশন

আমরা অনেকেই নিজেদের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে গিয়ে ধর্মের পবিত্রতাকেই নষ্ট করে ফেলি। ধর্ম পালনের আগে যদি আমরা মানবিক হতে পারি, তাহলে ধর্মের পবিত্রতা, দেশের শান্তি আর মানুষের নিরাপত্তা, সবই নিশ্চিত করা সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে আমরা এর উল্টা চর্চা করি। যার ফলে আমাদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে বিভাজন সৃষ্টি হয়। বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সেলিম সাহেব যেভাবে কথা বলে যাচ্ছেন, আমি মনে করি, এটা আগুন নিয়ে খেলার মতো। বাংলাদেশ একটি অগ্নিকুণ্ডের মতো, যেখানে এত স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে কথা বলাই মুশকিল। সেখানে তিনি যে সাহস নিয়ে কাজ করছেন, তা কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, এটা সৃষ্টিকর্তার বিশেষ দান। তিনি যে পরিবর্তনের ডাক দিয়েছেন, তার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত।

▪ এস এম শামসুল হুদা,

তথ্য সম্পাদক, হেযবুত তওহীদ।

হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠালগ্নে আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী যে লক্ষ্য স্থির করেছিলেন তা হচ্ছে সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর প্রেরিত ধর্মের প্রকৃত শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবতা, ন্যায়, শান্তি, সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। তিনি সকল ধর্ম সম্পর্কে যে শিক্ষা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তার সারবাণী হচ্ছে 'সকল ধর্মের মর্মকথা সবার উর্ধ্বে মানবতা'। আমরা যেন মানবজাতির জন্য একটি সুন্দর ও শান্তিময় পৃথিবী উপহার দেওয়ার জন্য কাজ করে যেতে পারি, সকলের কাছে সেই দোয়া এবং আশীর্বাদ কামনা করি।

▪ রুফায়দাহ পন্নী, সঞ্চালক

নারী ও শিল্প বাণিজ্য সম্পাদক, হেযবুত তওহীদ।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য সরকার অনেক সভা সেমিনার করছেন। কিন্তু শত শত বছর ধরে হিন্দু-মুসলমানের হৃদয়ের মধ্যে যে দেওয়াল সৃষ্টি হয়েছে, সেই দেওয়াল ভাঙবেন কী দিয়ে? সকল ধর্মের মানুষকে একটি মূল সত্যের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সেটা হচ্ছে, আমরা সবাই এক স্রষ্টার সৃষ্টি, এক বাবা-মায়ের সন্তান। আমরা সবাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবো, সত্যকে ধারণ করব। তাহলে আমাদের নাম হরিশংকর হোক কিংবা নুরুল ইসলাম হোক আমরা হবো প্রকৃত ধার্মিক।

অনুষ্ঠানে আরো যারা উপস্থিত ছিলেন

▪ শ্রদ্ধেয়া খাদিজা খাতুন
দপ্তর সম্পাদক ও প্রধান উপদেষ্টা, হেযবুত তওহীদ।

▪ মশিউর রহমান,
রংপুর বিভাগীয় আমির, হেযবুত তওহীদ।

▪ তোফাজ্জল হোসেন,
প্রকাশক, বিশ্বসাহিত্য ভবন

▪ হুমায়ুন কবির
প্রকাশক, চারুকলা

▪ শফিকুল আলম উখবাহ,
প্রচার সম্পাদক, হেযবুত তওহীদ।

কনফারেন্স হলেরই এক প্রান্তে স্থাপিত হয় হেযবুত তওহীদের বইয়ের স্টল।

- মনি হায়দার
  কথা সাহিত্যিক

- উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী
  স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক, হেযবুত তওহীদ

- শারমিন সুলতানা চৈতি,
  সদস্য, তথ্য বিভাগ হেযবুত তওহীদ

- ডা. মাহবুব আলম মাহফুজ,
  ঢাকা বিভাগীয় আমির, হেযবুত তওহীদ।

ছবিতে রয়েছেন, এস এম শামসুল হুদা, তথ্য সম্পাদক, হেযবুত তওহীদ। পিছনে অনুষ্ঠানের আয়োজক কমিটির সদস্যবৃন্দ যথা (বা থেকে) আয়েশা সিদ্দিকা, কেন্দ্রীয় যুগ্ম নারী বিষয়ক সম্পাদক, শারমিন সুলতানা চৈতি, সদস্য, তথ্য বিভাগ হেযবুত তওহীদ, তাসলিমা আক্তার, নারী সম্পাদক, ঢাকা বিভাগ, হেযবুত তওহীদ, ইলা ইয়াছমিন, নারী সম্পাদক, চট্টগ্রাম বিভাগ, হেযবুত তওহীদ।

অনুষ্ঠানের কিছু স্থিরচিত্র

নোয়াখালীর উন্নয়ন বিষয়ক প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন।

অনুষ্ঠান শেষে প্রেস ব্রিফিং।

দেশজুড়ে সর্বধর্মীয় সম্প্রীতি স্থাপনের উদ্যোগ

০৯ অক্টোবর ২০১৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনস্থ সেমিনার কক্ষে "সকল ধর্মের মর্মকথা - সবার উর্ধ্বে মানবতা" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন দৈনিক দেশেরপত্রের সম্পাদক রুফায়দাহ পন্নী। আলোচনায় আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক এম.পি।

আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, সাবেক প্রেসিডিয়াম সদস্য এডভোকেট ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন, প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারি মাহবুবুল হক শাকিল, নুরুল ইসলাম সুজন এম.পি.; শ্রী মনোরঞ্জন শীল গোপাল এম.পি; শাহজাহান কামাল এম.পি, মিসেস শাহানা রব্বানী এম.পি, সাবেক এম. পি তানভীর শাকিল জয় প্রমুখ।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ খ্রিস্টান কল্যাণ ট্রাস্ট এর সেক্রেটারি জেনারেল জয়েন্ট এবং বাংলাদেশ হিন্দু- বৌদ্ধ- খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এর সেক্রেটারি নির্মল রোজারিও, প্যাস্টর রবিনসন মণ্ডল (গোপালগঞ্জ), আনন্দমার্গ প্রচার সংঘের সভাপতি আচার্য্য সুজিতানন্দ অবধূত, দেশেরপত্রের উপদেষ্টা উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এর সাবেক সচিব ড. মঙ্গলচন্দ্র চন্দ, তরিকতে আহলে বায়াত এর সভাপতি আহমেদ কামরুল মোর্শেদ, বাংলাদেশ লাইব্রেরি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন এর সিইও মাহবুবুর রহমান, সাবেক রাষ্ট্রদূত ও অতিরিক্ত সচিব এস.এস.চাকমা, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় উপ-কমিটির সহ-সম্পাদক হাসিবুর রহমান, বাংলাদেশ ব্রাহ্ম সমাজ এর সাধারণ সম্পাদক শ্রী রণবীর পাল রবি, বস্ত্রদপ্তর এর সাবেক উপ-পরিচালক এস.বি. চাকমা, দৈনিক বজ্রশক্তির প্রকাশক ও সম্পাদক এস.এম.সামসুল হুদা, শ্রী শ্রী লক্ষ্মীকান্ত দূর্গা মন্দির, মানিকনগর এর সহ-সভাপতি শ্রী নবকুমার দাস, বেটার টুমরো সোসাইটির সেন্টার ইনচার্জ ড. হাসিনা আহমেদ, শিবশক্তি মিশন এর গণসংযোগ ও উন্নয়ন কর্মকর্তা রামানন্দ দাস প্রমুখ।

১১ আগস্ট ২০১৬ তারিখে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় অনুষ্ঠিত সর্বধর্মীয় সম্মেলনে বক্তব্য দিচ্ছেন হেযবুত তওহীদের মাননীয় এমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম।

২১ অক্টোবর ২০১৪ বিকেলে শিল্পকলা একাডেমীর চিত্রশালা মিলনায়তনে "সকল ধর্মের মর্মকথা, সবার উর্ধ্বে মানবতা" শীর্ষক একটি প্রাণবন্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন (বাম থেকে) হেযবুত তওহীদের রংপুর বিভাগের আমীর ও বাংলাদেশ সাংবাদিক জোটের সভাপতি মসীহ উর রহমান; বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভার ভ্যানারেবল করুণা ভিক্ষু; নেপালের ভিক্ষু থে ওয়ান থি, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি নৌ পরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খান এম. পি.; হেযবুত তওহীদের নারী বিভাগ ও দৈনিক দেশেরপত্রের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রুফায়দাহ পন্নী; হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সাবেক সচিব ড. মংগল চন্দ্র চন্দ।

প্রসিদ্ধ আলেমদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য পেশ করছেন হেযবুত তওহীদের মাননীয় এমাম। স্থান: ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি, তারিখ: ১৫.১০.২০১৬

১৩ জুন ২০১৪ তারিখে ফরিদপুরের ভাঙায় অবস্থিত একটি কালিমন্দিরে স্থানীয় সনাতনধর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করছেন হেযবুত তওহীদের প্রতিনিধিবৃন্দ।

৭ আগস্ট ২০১৪ চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা হলুদ পট্টি বণিক সমিতির হলরুমে হেযবুত তওহীদ কর্তৃক আয়োজিত সর্বধর্মীয় সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট শিল্পপতি বিজয় কুমার লাল মোদী। উপস্থিত ছিলেন শিল্পপতি বাবু গণেশ লাল মোদী, বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ নুর মোহাম্মদ, আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সভাপতি আবু তালেব মিয়া, চুয়াডাঙ্গা পূজা উদ্যাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ অমল কুমার বিশ্বাস, ভক্তি প্রসাদ মধুসুদন মহারাজ, কৃষ্ণ-শ্রী মাধব গৌরীয় মঠ ঢাকা, সমাজসেবক বাবু লাল, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ্ আলম প্রমুখ।

১২ জুলাই ২০১৪ তারিখে সিলেট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে হেযবুত তওহীদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে সিলেট জেলা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিলেট জেলা প্রশাসক মো. শহিদুল ইসলাম, সিলেট প্রেসবিটারিয়ান চার্চ এর সহকারী পুরোহিত ডিকন নিঝুম সাংমা, বিশপ হাউস, সিলেট এর ধর্মযাজক ফাদার হেনরী রিবেরু, সিলেট বৌদ্ধবিহার অধ্যক্ষ শ্রীমৎ সংঘানন্দ থের প্রমুখ।

২৯ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে দৈনিক বজ্রশক্তির ৪র্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শিশু একাডেমী মিলনায়তনে একটি বিশেষ আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দেশবরেণ্য নাট্যব্যক্তিত্ব, শিল্পী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাবিদ, বিচারপতি, সমাজকর্মী, মানবাধিকারকর্মীগণের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে দিয়েছিল অনন্য মাত্রা। অনুষ্ঠানে মুখ্য বক্তব্য উপস্থাপন করেন জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সোসাইটির চেয়ারম্যান ও হেযবুত তওহীদের এমাম জনাব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম। অনুষ্ঠানে কেক কেটে দৈনিক বজ্রশক্তির ৪র্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশিদ, সুপ্রীম কোর্টের সাবেক বিচারপতি শিকদার মকবুল হক, বিশিষ্ট সমাজসেবক জাফর ইকবাল বাপ্পী, বিশিষ্ট আইনজীবি ও মানবাধিকার কর্মী ব্যারিস্টার মঞ্জিল মোর্শেদ, বাংলাদেশ কৃষক লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক জনাব ব্যারিস্টার জনাব সরোয়ার জাহান, সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগের প্রাক্তন বিচারপতি সিদ্দিকুর রহমান মিয়া, বিশিষ্ট সাংবাদিক আব্দুর রহিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সুপার নিউমারারী অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান ও নগর সৌন্দর্যবিদ রাফেয়া আবেদিন প্রমুখ।

১৮ ডিসেম্বর ২০১৮, রাজধানীর শিশু একাডেমী মিলনায়তনে হেযবুত তওহীদ কর্তৃক আয়োজিত "সভ্য জাতি বিনির্মাণে সংস্কৃতি" শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে সভাপ্রধান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় এমাম জনাব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম। প্রধান অতিথির প্যানেলে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, বিশিষ্ট অভিনেতা ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) প্রয়াত অধ্যাপক ড. এনামুল হক ও বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন বিশিষ্ট অভিনেতা ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক জনাব নাদের চৌধুরী, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেতা জনাব আফজাল শরীফ, বাংলাদেশ শিশু একাডেমির এমপ্লয়ার এস্যোসিয়েশনের সভাপতি জনাব দেওয়ান মো. হাফিজ, ঢাকা সাংবাদিক ফোরামের সহ-সভাপতি ও সিনিয়র সাংবাদিক বরুণ ভৌমিক নয়ন, নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক, বিশিষ্ট কবি প্রয়াত ফরিদা মজিদ, প্রাক্তন উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শক (ডিআইজি) জনাব পি আর বড়ুয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্যকলা বিভাগের প্রভাষক তামান্না রহমান প্রমুখ।

১০ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে রাজধানীর তেজগাঁও সরকারি কলেজ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জনাব তাফাজ্জল হোসেন, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রয়াত অভিনেতা জনাব এটিএম শামসুজ্জামান, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লালনগীতি শিল্পী ফরিদা পারভিন প্রমুখ।

সনাতন ধর্ম ও ইসলাম

আমরা দেখব হিন্দু ও মুসলমানের বিশ্বাসগতভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে হাজার হাজার সম্ভাবনা রয়েছে। এই দুটো ধর্মদর্শনের মৌলিক বহু বিষয়ের গোড়া এক জায়গায়, দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে কেবল ডালপালা নিয়ে। এখন এই দুটো ধর্মের মধ্যে কী কী বিষয় সামঞ্জস্যপূর্ণ সেদিকে আলোকপাত করব।

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

এ কথা সকল তথ্যাভিজ্ঞ মানুষই স্বীকার করবেন যে, বিশ্ব রাজনীতি অর্থনীতি ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে এখন ধর্ম এক নম্বর ইস্যু। পাঁচ শতাব্দী আগে ইউরোপে বস্তুবাদী ধর্মহীন একটি সভ্যতার উন্মেষ ঘটে এবং পরবর্তী সময়ে তারা যখন বিশ্বের নিয়ন্ত্রকে পরিণত হয় তখন তাদের তৈরি ব্যবস্থাগুলোকে দুনিয়াজুড়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে চর্চিত বস্তুবাদী ধর্মহীন পাশ্চাত্য 'সভ্যতা'র প্রভাবে পৃথিবীর মানুষ এখন এতটাই মানবতাবোধহীন, আত্মাহীন, জড়বাদী, স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিকে পরিণত হয়েছে যে সকল চিন্তাশীল, সাহিত্যিক, সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই এখন একবাক্যে স্বীকার করছেন যে, যদিও ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি ও পৈশাচিকতা রুখতে ধর্মকে বাদ দিয়েই জাতীয় জীবন পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত ইউরোপে গৃহীত হয়েছিল কিন্তু সেটার ফল আশানুরূপ হয় নি, মানুষ শান্তি পায় নি। যেটা পেয়েছে সেটা হলো যান্ত্রিক প্রগতি (Technological advancement)। তারা দেখতে পাচ্ছেন যে, বাস্তবে কোথাও ধর্মকে বাদ দেওয়া সম্ভব হয় নি। শত সহস্র বছর থেকে মানুষের মনে লালিত ধর্মবিশ্বাস দূর করা যায় নি। এ কারণে তারা নীতি পাল্টিয়ে ধর্মকে ব্যক্তিগত উপাসনার সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ করে। কিন্তু একটা পর্যায়ে রাষ্ট্র যখন কল্যাণ রাষ্ট্র (Welfare state) উপাধি ধারণ করে ব্যাপকভাবে জনসম্পৃক্ত হওয়া শুরু করল, মানুষও রাষ্ট্রের নানা কাজে অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ত

হওয়ার সুযোগ পেল, তখন সেই ধর্মবিশ্বাস আর ব্যক্তিগত পর্যায়ে গণ্ডিবদ্ধ থাকে নি। নানা ইস্যুতে, নানা প্রেক্ষাপটে, ঘটনাপ্রবাহের নানা বাঁকে সেই ধর্মবিশ্বাস রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতোমধ্যেই ধর্মব্যবসায়ী একটি গোষ্ঠী নানা ইস্যুতে মানুষের ধর্মীয় চেতনাকে ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি সৃষ্টি করেছে। তখন রাষ্ট্রকে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। ধর্ম দিনশেষে ব্যক্তিগত গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে নি। এখন মধ্যপ্রাচ্যের দখলদারিত্ব নিয়ে এবং জঙ্গিবাদের উত্থানের ইস্যুকে কেন্দ্র করে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে মানবজাতি। এ পরিস্থিতিতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ধর্ম এখন বিশ্ব রাজনীতির এক নম্বর ইস্যু। ইউরোপে ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে সেখানকার সেক্যুলার দলগুলো রাজনীতির মাঠ দখল করেছিল সেই মাঠ এখন ডানপন্থী খ্রিস্টান প্রভাবাধীন দলগুলোর হাতে চলে যাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যে শিয়া-সুন্নী ইস্যুতে এবং জঙ্গিবাদ ইস্যুতে যুদ্ধ চলছে তো চলছেই। সেখানে বিশ্বের বড় বড় পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলো জড়িত হয়ে গেছে। আর এই ভারত উপমহাদেশে ধর্মীয় উগ্রবাদী গোষ্ঠীর ক্রমশ উত্থান কীভাবে রাজনীতির অঙ্গনে কলকাঠি নাড়ছে সেটা সবাই জানেন।

ঔপনিবেশিক যুগ থেকে ভারতবর্ষেও চেষ্টা করা হয়েছে ধর্মকে জাতীয় জীবন থেকে বাদ দিয়ে দেওয়ার জন্য। ব্রিটিশ যুগের পূর্বে এ অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান এই দুটো ধর্মের অনুসারীই ছিল সংখ্যাগুরু। তার আগে বৌদ্ধরা ছিল বড় জনগোষ্ঠী। মুসলমানদের আগমনের পর কোটি কোটি ভারতবাসী ইসলামের সুশাসন, শৃঙ্খলা, ন্যায়, সুবিচার, সাম্য ও উন্নত আদর্শের পরিচয় পেয়ে মুসলিম হয়। এখনও হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ এই পাক-ভারত উপমহাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ। বর্তমান বাস্তবতায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যগঠন করা, দীর্ঘদিন ধরে বিরাজিত তাদের পারস্পরিক মনোমালিন্য ও মানসিক দূরত্ব দূর করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতে ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠী স্বীয় দেশের সংখ্যালঘুদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা চালিয়ে প্রায়ই নির্মমভাবে ধর্মীয় উগ্রতার প্রকাশ ঘটাচ্ছে। এখানে করা হচ্ছে হিন্দুদের উপর আর ভারতে করা হচ্ছে মুসলমানদের উপর।

এই দাঙ্গা, হামলার প্রেক্ষিতে উভয় ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে আরো সন্দেহ, আরো দূরত্ব, আরো বিদ্বেষ সৃষ্টি হচ্ছে। এই শত্রুতামূলক মনোবৃত্তি যতদিন তাদের মধ্যে বজায় রাখা যায় ততই সাম্রাজ্যবাদী, অস্ত্রব্যবসায়ী পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর জন্য সুবিধা; তারা এই দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে ফায়দা হাসিল করতে পারবে। মধ্যপ্রাচ্যে তারা শিয়া-সুন্নীর দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে তেলসম্পদসমৃদ্ধ দেশগুলো দখল করে নিচ্ছে। আমাদের এখানে হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বটিকে কাজে লাগানোর সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। আমাদের বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, যদি আমরা সত্যিই আমাদের দেশটিকে ভালোবাসি, আমরা উপলব্ধি করি যে এ দেশের মাটিতে আমাদের পূর্বপুরুষের অস্থিমজ্জা মিশে আছে, এই মাটি দিয়ে হিন্দুরা মূর্তি বানিয়ে পূজা করে আর মুসলমানেরা এই মাটি দিয়েই ইটের মসজিদ গড়ে নামাজ পড়ে। এই মাটির ফল-ফসল খেয়েই হিন্দু - মুসলমান উভয় জাতির মানুষ পুষ্ট হয়। আমাদের এই অঞ্চলে হিন্দু মুসলমানের ভিতরে বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব এখন প্রবল যা অবিলম্বে দূর করা জরুরি। যখন কোনো লোকালয়ে অগ্নিকাণ্ড হয় তখন কারো ভবনই রক্ষা পায় না, দেবালয় মসজিদ কিছুই এড়ায় না। যখন ইরাক আক্রান্ত হলো তখন সিরিয়ার লোকজন বারে গিয়ে ফুর্তি করেছে। কিন্তু কয়দিন পরে দেখা গেল সেই আগুন সিরিয়াকেও ছাড়ল না, এখন সিরিয়ার মানুষ ইউরোপে ভিক্ষা করে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করা সহজ কিন্তু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন করা অত সহজ নয়। ওটা অত্যন্ত কঠিন কাজ। সরকারগুলো চেষ্টা করে আইন দিয়ে, শক্তি দিয়ে, অর্থ দিয়ে কারণ সরকারের কাছে ওগুলোই আছে। সরকারের প্রতিনিধিরা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়ান, ক্রন্দনরত মানুষের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে সান্তনা দেন, ভাঙা উপাসনালয় সংস্কার করে দেন, ভাঙা মূর্তি জোড়া লাগিয়ে দেন, আর্থিক ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মানুষের মন যখন ভেঙে যায় তখন সেটা জোড়া লাগানো সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় না। সেজন্য এখন দুই সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসতে হবে। ধর্ম এক নম্বর ইস্যু, ধর্মকে ব্যবহার করে জাতিকে বিভক্ত করা হচ্ছে, বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই বিদ্বেষ বিভক্তি দূর করতে হলে উভয় সম্প্রদায়কে মুক্ত মন নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। এটা করার জন্য তাদের উভয়কেই বুঝতে হবে তাদের গোড়া কোথায়, তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া জরুরি কিনা, তারা আদৌ ঐক্যবদ্ধ হতে চায় কিনা। ঐক্যবদ্ধ হতে হলে উভয়পক্ষকেই ছাড় দিতে হয়। তারা তাদের উভয়ের লালিত ধ্যানধারণা, সংস্কার থেকে কতটুকু ছাড় দিতে রাজি হবে। যেহেতু বিষয়টি ধর্মীয় তাই ধর্মবিশ্বাসের মধ্য থেকে কতটুকু তারা বিসর্জন দিতে পারবে, কতটুকু গ্রহণ করতে পারবে, ঐক্যের স্বার্থে তারা কতটুকু উদারতা নিজেদের মধ্যে আনয়ন করতে পারবে এগুলো বিবেচনায় নিতে হবে।

আমরা দেখব হিন্দু ও মুসলমানের বিশ্বাসগতভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে হাজার হাজার সম্ভাবনা রয়েছে। এই দুটো ধর্মদর্শনের মৌলিক বহু বিষয়ের গোড়া এক জায়গায়, দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে কেবল ডালপালা নিয়ে। এখন এই দুটো ধর্মের মধ্যে কী কী বিষয় সামঞ্জস্যপূর্ণ সেদিকে আলোকপাত করব।

একেশ্বরবাদ: ওয়াহদানিয়াত বা একত্ববাদ। ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহকে একমাত্র হুকুমদাতা হিসাবে মানা, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক না করা। সনাতন ধর্মেরও মর্মবাণী একমেবাদ্বীতিয়ম (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬:২:১), একমব্রহ্ম দ্বৈত্ব নাস্তি। যার অর্থ হচ্ছে প্রভু ব্রহ্ম একজন। তাঁর কোনো শরিক নাই।

এক বাবা-মা: এক পিতামাতা থেকে সমগ্র মানবজাতির

উদ্ভব হয়েছে। এই বিশ্বাস সনাতন ও ইসলাম উভয় ধর্মের অনুসারীরাই লালন করেন। ইসলামে বলা হচ্ছে তাঁরা হচ্ছেন বাবা আদম ও মা হাওয়া। সনাতন ধর্মে তাঁদেরকে বলা হচ্ছে আদম ও হব্যবতী (ভবিষ্যপুরাণ)।

নুহ (আ.) ও রাজা মনুহ্: মহর্ষী মনুই হচ্ছেন বৈদিক ধর্মের মূল প্রবর্তক। তিনিই হচ্ছেন কোর'আনে বর্ণিত নুহ (আ.)। পুরাণে মহাভারতে তাকে বৈবস্বত মনু, রাজা ন্যূহ ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁর উপরই নাযেল হয় বেদের মূল অংশ। তাঁর সময়ে এক মহাপ্লাবন হয় যাতে কেবল তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা একটি বড় নৌকায় আরোহণ করে জীবনরক্ষা করেন। তাদের সঙ্গে প্রতিটি প্রাণীর এক জোড়া করে রক্ষা পায়। তাঁদের মাধ্যমেই পৃথিবীতে আবার মানবজাতির বিস্তার ঘটে। এজন্যই হাদিসে নুহ (আ.) কে দ্বিতীয় আদম বলা হয়। হিন্দু ধর্মের মৎস্যপুরাণ গ্রন্থে এবং মহাভারতেও একই ঘটনার বিবরণ রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে বৈবস্বত মনুর জীবনে এমনটিই ঘটেছিল। সেই মহাপ্লাবনের পর এই মনু থেকেই মনুষ্যপ্রজাতির বিস্তার ঘটে। এজন্য সনাতন মনুকেও মানবজাতির আদিপিতা বলা হয়ে থাকে।

সনাতন ধর্ম ও দীনুল কাইয়্যেমাহ: ইসলামের এক নাম দীনুল কাইয়্যেমা। শব্দটি এসেছে কায়েম থেকে যার অর্থ শ্বাশ্বত, সুপ্রতিষ্ঠিত, চিরন্তন জীবনব্যবস্থা। সনাতন অর্থও তাই। যে নীতি বা ধর্ম ছিল, আছে এবং থাকবে সেটাই হচ্ছে সনাতন বা কাইয়্যেমাহ।

দুই জীবন: উভয় ধর্মেই ইহকাল ও পরকালের ধারণা রয়েছে। মো'মেনদের জন্য জান্নাত আর কাফেরদের জন্য জাহান্নাম। সনাতন ধর্মেও রয়েছে ধার্মিকদের জন্য স্বর্গ ও অধার্মিকদের জন্য নরক। ইসলাম বলছে জান্নাতে যাওয়ার আগে প্রত্যেক ব্যক্তিকে পুলসিরাত পার হতে হবে, আর সনাতন ধর্ম বলছে বৈতরণী নদী পার হয়ে বৈকুণ্ঠে যেতে হবে।

উপাসনা পদ্ধতি: উভয় ধর্মের উপাসনা পদ্ধতির মধ্যেও অনেক মিল। কোরবানি ও বলিদান, সিয়াম পালন ও উপবাস, সুরা ও মন্ত্রপাঠ, যিকির ও যপতপ, হজ্ব ও তীর্থযাত্রা, সেজদা ও প্রণিপাত, তসবিহ ও যপমালা, উপাসনার ওয়াক্ত ও তিথি বা ত্রিসন্ধা ইত্যাদি বহুকিছু একই রকম।

মালায়েক ও দেবদেবী: ইসলামে সৃষ্টিজগৎ পরিচালনার জন্য অসংখ্য ফেরেশতার কথা বলা হয়েছে তেমনি হিন্দু ধর্মে আছে তেত্রিশ কোটি দেবদেবী। এই ফেরেশতা ও দেবদেবী এক বিষয় কিনা এ নিয়ে ইসলামের আলেমদের মধ্যে অবশ্য মতভেদ রয়েছে, যেমনটা অধিকাংশ বিষয়েই তারা করে থাকেন।

এরকম উদাহরণ দিতে থাকলে হাজার হাজার দেওয়া যাবে। বেদ ও কোর'আনের যে আয়াত ও শ্লোকগুলো হুবহু একার্থবোধক তার তালিকা এত দীর্ঘ হবে যে এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। এত মিল থাকা সত্ত্বেও এই দুটো সম্প্রদায় একত্রে থাকতে পারছে না যে বিষয়গুলো নিয়ে সেগুলো হচ্ছে নিতান্তই ধর্মের গৌণ বিষয় যেমন খাদ্যাভ্যাস, উপাসনাপদ্ধতি, পোশাক-আশাক ইত্যাদি নিয়ে। এক সময় এদেশের মুসলমানেরাও ধুতি পরত, কিন্তু ধুতিকে হিন্দুর পোশাক বলা হচ্ছে। এসব অতি তুচ্ছ বিষয়। অমিলের বিষয়গুলো খুবই দুর্বল, কিন্তু মিলের বিষয়গুলো খুবই মৌলিক। তবে আমার ব্যক্তিগত মত হলো, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখা উচিত মুসলমানদেরকেই। কেন সেটা বলছি।

আমরা জানি, আমাদের নবী কেবল আরবের নবী নন, তিনি বিশ্বনবী। তিনি নিজেই বলেছেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি সমগ্র পৃথিবীতে সত্যদীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে। আল্লাহ নিজেও পবিত্র কোর'আনে বলেছেন, হে নবী আপনি বলুন, আমি তোমাদের সকলের জন্য (জামিয়া) আল্লাহর রসুল (সুরা আরাফ ১৫৮)। তাঁর টাইটেল হচ্ছে রহমাতাল্লিল আলামীন, সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমত। এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান কোনো ভেদাভেদ রাখা হয় নি। এক সাহাবির উপর নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেছেন, তুমি দেখবে অচিরেই এমন সময় আসবে যখন একা একটা সুন্দরী মেয়ে সর্বাঙ্গে অলঙ্কারপরিহিত অবস্থায় রাতের অন্ধকারে সা'না থেকে হাদরামাউত চলে যাবে, তার মনে আল্লাহ ও বন্য পশুর ভয় ছাড়া কোনো ভয় থাকবে না। এখানে বলা হয় নি যে সেই নারী হিন্দু, নাকি মুসলমান, নাকি খ্রিস্টান বা ইহুদি। কাজেই এটি পরিষ্কার যে, নবী এসেছেন সমগ্র মানবজাতির অর্থনৈতিক মুক্তি, সামাজিক নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এ দায়িত্ব আল্লাহই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তোমরাই সেরা জাতি। তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে মানবজাতিকে (নাস) ন্যায়ের আদেশ করবে এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখবে (সুরা ইমরান ১১০)। আল্লাহ ও তাঁর রসুল কর্তৃক উম্মাহর উপর অর্পিত সুস্পষ্ট দায়িত্ব এটি, এ থেকে পলায়ন করার কোনো সুযোগ নেই। তাই সকল জাতি, ধর্মের মানুষের জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য বনী আদমকে এক কাতারে নিয়ে আসা উম্মতে মোহাম্মদীর দায়িত্ব। এজন্যই এ দীনের অন্যতম একটি নীতি আল্লাহ ঠিক করে দিয়েছেন যে, লা ইকরাহা ফিদ্দীন অর্থাৎ দীন নিয়ে জবরদস্তি চলবে না। দীন নিয়ে বাড়াবাড়িও চলবে না।

তাছাড়া মুসলমান হওয়ার অন্যতম শর্ত সকল নবী-রসুলদের প্রতি এবং আল্লাহর নাজেল করা সকল ধর্মগ্রন্থের প্রতি ঈমান রাখা। পবিত্র কোর'আনে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি প্রত্যেকটি জনপদে, প্রত্যেক ভাষাভাষী মানুষের জন্য নবী পাঠিয়েছেন। তাহলে এত বিরাট ও প্রাচীন জনপদ ভারতবর্ষে কি কোনো নবী আসেন নি, কোনো কেতাব আসে নি? অবশ্যই এসেছেন, তবে কালের আঘাতে তাদের শিক্ষাও বিকৃত হয়ে গেছে। তাদের প্রতিও মুসলমানদের বিশ্বাস রাখা বাধ্যতামূলক। আল্লাহ নবী-রসুল পাঠিয়েছেন এক লক্ষ চব্বিশ হাজার অথবা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার। তার মধ্যে কোর'আনে এসেছে মাত্র সাতাশ/আটাশ জনের নাম। বাকিদের অনুসারীরাও তো পৃথিবীতে আছেন, তাদেরকেও হেদায়াতের পথে আনার দায়িত্ব মুসলমানদের উপরই আল্লাহ অর্পণ করেছেন। কারণ তাদের কাছেই আছে শেষ কেতাব যেটা

কেউ বিকৃত করতে পারে নি এবং শেষ নবীর আদর্শ। সেই আদর্শ উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় আজও মানবজাতির আকাশ জাজ্বল্যমান। শেষনবী বাস্তবে দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে অন্যসব জাতিধর্মের মানুষকে নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করা যায়।

কাজেই আমাদেরকে ছাড় দিতে হবে বেশি, আমাদেরকে উদার ও সহনশীল হতে হবে বেশি। আল্লাহর এই দীনের ঘরের দরজা অনেক বড়। এখানে গোটা মানবজাতি প্রবেশ করবে। ঐ দরজায় খিল লাগিয়ে তা সংকীর্ণ করা হবে আত্মঘাতী। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে গত কয়েক শতাব্দী থেকে তা-ই করা হয়েছে। আজকের মুসলিম জাতির এই হীনতার কারণ ঐ দায়িত্ব থেকে পলায়ন করে শরিয়ার টুকিটাকি বিষয় নিয়ে অহেতুক বাড়াবাড়ি আর জবরদস্তি।

হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মুসলিম জাতির ভূমিকা অগ্রণী হলেও হিন্দু সম্প্রদায়েরও দায়িত্ব কম নয়। এটা চরম মূর্খতার পরিচয় যে আমরা এক স্রষ্টা থেকে আগত, এক জাতি, এক বাবা মায়ের সন্তান হয়েও এভাবে একে অপরকে বিধর্মী মনে করে নিজেদের পায়ে নিজেরা কুড়াল মেরে চলেছি। আমরা এক ভাই আরেক ভাইকে অশুচি অপবিত্র মনে করি। আচারের নামে এইসব অনাচার ধর্মের সৃষ্টি নয়, ধর্মব্যবসায়ীদের সৃষ্টি। আমাদেরকে বুঝতে হবে, স্রষ্টা শুধু মসজিদে মন্দিরে চার্চে প্যাগোডায় থাকেন না। স্রষ্টা আর্ত-পীড়িত, নির্যাতিত মানুষের আর্তচিৎকারে ব্যথিত হন। অথচ ধর্মব্যবসায়ীরা এই নির্যাতিত মানুষের দায়িত্ব শয়তান, অত্যাচারী, ডেভিল, দুর্বৃত্তদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজেরা পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য মসজিদ, মন্দির, গির্জায়, প্যগোডায় ঢুকেছেন। তারা ধর্মকে বাস্তবজীবনের সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে না দেখে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা, উৎসব, উপাসনা, পূজা-প্রার্থনার বস্তুতে পরিণত করেছেন। তারা নবী-রসুল ও অবতারদের প্রাণান্তকর সংগ্রামকে অবজ্ঞা করে চলেছেন। তারা ধর্ম ত্যাগ করে লেবাস ধরেছেন। তারা মানুষকে জানতে দিচ্ছেন না যে, সকল ধর্মেই ধর্মব্যবসা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আমরা যারা প্রকৃতপক্ষেই স্রষ্টার সান্নিধ্য চাই, তাদেরকে বুঝতে হবে যে, নামাজ, রোজা, উপবাস, উপাসনা, পূজা অর্চনা ধর্মের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। মানুষের সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠাই সকল ধর্মের লক্ষ্য, সকল ধর্মের আত্মা। তাইতো ওঙ্কার ধ্বনীর অর্থ শান্তি, ইসলাম শব্দের অর্থও শান্তি। এজন্য মানুষের কল্যাণসাধনই প্রকৃত এবাদত। যে ধর্ম মানবসমাজে শান্তি দিতে পারে না, সেটা প্রকৃত ধর্ম নয়, সেটা ধর্মের লাশ। আজ সারা বিশ্বে যে ধর্মগুলি চালু আছে সেগুলোকে প্রাণহীন লাশ বানিয়ে রাখা হয়েছে এবং সেই লাশকে নিয়েই ব্যবসা করছেন কথিত আলেম ও পুরোহিত গোষ্ঠী। মানুষের পেটে যখন ভাত নেই, উপাসনালয় থেকেও যখন জুতা চুরি হয়, যেখানে চার বছরের শিশুও ধর্ষিত হয় তখন সেই অন্যায় অবিচার বন্ধ না করে, তার ন্যূনতম প্রতিবাদও না করে যারা মসজিদে-মক্কায় গিয়ে মনে করছেন আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট, মন্দিরে গিয়ে দুধ-কলা দিয়ে, গয়া-কাশিতে গিয়ে মনে করছেন ভগবান ও দেবতারা বুঝি স্বর্গ থেকে তাদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করছেন, তারা ঘোর ভ্রান্তির মধ্যে আছেন।

আল্লাহর রসুল বলেছেন, 'যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, কোন মানুষের ঈমান সঠিক হতে পারবে না যতক্ষণ না সে সৎ ও বিশ্বাসী হয়। আমি তোমাদেরকে হেদায়েত করছি যে তোমরা কোন ব্যক্তির অধিক নামায ও অধিক রোযা দেখে ভুল করো না, বরং লক্ষ্য করো সে যখন কথা বলে সত্য বলে কি না, তার কাছে রাখা আমানত বিশ্বস্ততার সাথে ফিরিয়ে দেয় কিনা এবং নিজের পরিবার পরিজনের জন্য হালাল উপায়ে রোজগার করে কিনা।' (সিরাত বিশ্বকোষ - ইসলামিক ফাউন্ডেশন)।

একই শিক্ষার প্রতিধ্বনি করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "কেহ ধার্মিক কি অধার্মিক পরীক্ষা করিতে হইলে দেখিতে হইবে, সে ব্যক্তি কতদূর নিঃস্বার্থ। যে অধিক নিঃস্বার্থ সে অধিক ধার্মিক। সে পণ্ডিতই হউক, মূর্খই হউক, সে শিবের বিষয় জানুক বা না জানুক সে অপর ব্যক্তি অপেক্ষা শিবের অধিকতর নিকটবর্তী। আর যদি কেহ স্বার্থপর হয়, সে যদি পৃথিবীতে যত দেবমন্দির আছে, সব দেখিয়া থাকে, সব তীর্থ দর্শন করিয়া থাকে, সে যদি চিতা বাঘের মতো সাজিয়া বসিয়া থাকে, তাহা হইলেও সে শিব হইতে অনেক দূরে অবস্থিত (রামেশ্বর-মন্দিরে প্রদত্ত বক্তৃতা)।

আমাদের এই অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বলতে কিছু ছিল না। ব্রিটিশদের শাসনযুগের আগে এখানে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা একটিও হয় নি। হ্যাঁ, রাজনৈতিক সংঘাত অনেক হয়েছে, তবে সাম্প্রদায়িক সংঘাত একটাও নয়। ব্রিটিশ বেনিয়ারা ভারত দখল করার পরই চালিয়ে দিল Divide and rule নীতি। তারা হিন্দু ও মুসলিমদের জন্য আলাদা স্কুল-কলেজ বানালো, আলাদা রাজনৈতিক দল বানালো, আলাদা হোটেল বানালো, কলেজে আলাদা হোস্টেল বানালো। তারা হিন্দুদেরকে শেখালো মুসলিমরা বিদেশী আগ্রাসনকারী জাতি, তারা এ মাটির সন্তান নয়। এতদিন যে দেশে হিন্দু মুসলিম শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করেছে, একই বাজারে সদাই করেছে, একই পুকুরের পানি খেয়েছে, হিন্দু ডাক্তার মুসলমান রোগীর চিকিৎসা করেছে, মুসলমানদের চাষ করা ফসল হিন্দুরা খেয়েছে সেই দেশেই সৃষ্টি হলো জাতিগত দাঙ্গার। রায়টে লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমানের লাশ পড়ল, বাড়ি পুড়ল, উদ্বাস্তু হলো। শেষতক এক দেশে থাকাও তাদের পক্ষে সম্ভব হলো না, তারা দুই জাতির জন্য দুটো দেশ ভাগ করে ফেলল। এ সবই হলো ব্রিটিশদের কূটবুদ্ধির ফল। আজ হিন্দুদের উগ্রবাদী একটি গোষ্ঠী ইসলাম ধর্মের মহামানবদেরকে, কেতাবকে গালি দেয়, মুসলমানদের উগ্রবাদী ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠী হিন্দুদের উপাস্যদেরকে, অবতারগণকে গালি দেয়। তাদের এই পারস্পরিক বিদ্বেষ সাধারণ ধর্মবিশ্বাসী মানুষের মধ্যে ছড়ায়। তখন সৃষ্টি হয় দাঙ্গা। এই দাঙ্গার পরিণতি কী তা ভারতবাসী গত দেড়শ' বছরে প্রত্যক্ষ করেছে, সেটা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। ব্রিটিশরা এভাবে দুই ভাইকে শত্রুতে পরিণত করে দিয়ে গেছে। এইসব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে ধান্দাবাজ রাজনৈতিক গোষ্ঠী কীভাবে কাজে লাগায় সে তথ্যও সকলের জানা।

কিন্তু এই শত্রুতা আর কতদিন? এখনও কি সময় হয় নি

শত্রুতা ভুলে নিজেদের সত্যিকার পরিচয়কে স্বীকৃতি দিয়ে আবার ভাই ভাই হয়ে যাওয়ার? এটা করার জন্য প্রয়োজন কেবল মানসিকতার পরিবর্তনের, প্রয়োজন সত্য সম্পর্কে জানার। আমরা এই দুটো জাতির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছি, তাদের উভয়ের ধর্মের মূল সত্য যে এক সেটাকে উভয়ের ধর্মগ্রন্থ থেকেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমরা বলছি, ধর্ম কোনো আচার অনুষ্ঠানের নাম নয়, ধর্ম হচ্ছে একটি বৈশিষ্ট যা কোনো বস্তু ধারণ করে। আগুনের ধর্ম হলো পোড়ানো, পানির ধর্ম ভেজানো, চুম্বকের ধর্ম আকর্ষণ করা। আগুন যদি না পোড়ায়, পানি যদি না ভেজায়, চুম্বক যদি না টানে তাহলে সে তার ধর্ম হারালো। তেমনি মানুষের প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে মানবতা। এই মানবতাবোধে মানুষকে জাগ্রত করার জন্যই নবী-রসুল-অবতারগণ যুগে যুগে আবির্ভূত হয়েছেন। তারা সত্য নিয়ে এসেছেন, যারা সেই সত্যকে ধারণ করেছেন তারাই হয়েছে ধার্মিক। যদি মানুষ সত্যকেই ধারণ না করে, মানবতাবোধে পূর্ণ না হয় সে যতই উপাসনা করুক সে ধর্মহীন। ইসলামের একটি নাম হচ্ছে দীনুল হক যার অর্থ সত্য জীবনব্যবস্থা। যে জীবনব্যবস্থা মানবজাতিকে সত্যে পূর্ণ করবে সেটাই তো প্রকৃত ধর্ম। শেষ নবী আরবে এসেছেন, তাই কোর'আনও এসেছে আরবিতে। কিন্তু ভারতবর্ষের অবতারগণ কথা বলেছেন সংস্কৃতিতে বা এ অঞ্চলের কোনো ভাষায়। তাঁদের উপর যে শাস্ত্রবাণী এসেছে সেগুলো এ অঞ্চলের মানুষের ব্যবহৃত ভাষাতেই এসেছে। ভাষার পার্থক্য থাকলেও সত্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। খালের পানি, নদীর পানি, সাগরের পানি, বৃষ্টির পানি সব পানিরই আণবিক গঠন অভিন্ন।

মুসলমানেরা যদি মনে করে আরবভূমি তাদের, হিন্দুরা যদি মনে করে ভারত কেবল তাদের, খ্রিস্টানরা যদি মনে করে ইউরোপ শুধু তাদের, ইহুদিরা যদি মনে করে ফিলিস্তিন কেবল তাদের, বৌদ্ধরা যদি মনে করে মিয়ানমার কেবল তাদের তাহলে সেটা হবে চরম মূর্খতা। কারণ পৃথিবী আল্লাহর, সমস্ত ভূমি আল্লাহর। মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, মাটিতেই আবার তাকে ফিরে যেতে হবে। তাই এই মাটির উপর অধিকার রয়েছে প্রত্যেক বনি আদমের। কোর'আন মোতাবেক মাটির মানুষের ভিতরে আল্লাহর রূহ রয়েছে। সনাতন ধর্মমতে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই পরমাত্মার অংশ রয়েছে। প্রতিটি মানুষ স্রষ্টার প্রতিভূ। সেই মানুষের অধিকারকে অস্বীকার করে কেউ আল্লাহর, পরমাত্মার, ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারবে না।

একই ভাবে খ্রিষ্টধর্ম, ইহুদিধর্ম, জরোথুস্ত্রীয় ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্মও একই স্রষ্টা থেকে আগত, যদিও তাদের ধর্মের প্রকৃত শিক্ষাকে বিকৃত করে ফেলা হয়েছে। এদের সকলকেই তাদের স্ব স্ব ধর্মগ্রন্থের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করে এক মহাজাতিতে পরিণত করা সম্ভব। সেটা কীভাবে তা পরবর্তী কোনো এক সময় আলোচনা করার ইচ্ছা রইল। তবে সকল ধর্মের অনুসারীদেরকে একটা কথা উপলব্ধি করতে হবে যে, আল্লাহ, ঈশ্বর, গড, এলি, ভগবান, পরমব্রহ্ম চান মানবজাতির ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব। আর ইবলিস, শয়তান, এভিল স্পিরিট, ডেভিল, লুসিফার, আসুরিক শক্তি চায় মানুষে মানুষে অনৈক্য, শত্রুতা, বিদ্বেষ। যারা প্রকৃত ধার্মিক তারা বিশ্বাস করেন, আল্লাহর এই চাওয়াকে পূরণ করাই হলো ধর্ম।

এত কথা, এত লেখার উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য পরিষ্কার, তা হলো এই- এ অঞ্চলে অন্তত মধ্যপ্রাচ্যের মতো জঙ্গিবাদী তাণ্ডব সেভাবে এখনও বিস্তার লাভ করে নি, তবে সেই ষড়যন্ত্র চলছে। আর এই তাণ্ডবকে রুখে দিতে হলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে পরস্পরের দিকে ঐক্যের হাত প্রসারিত করতে হবে। কেবল ঈদের দিনে মুসলমানে মুসলমানে কোলাকুলি আর পূজার দিনে হিন্দুতে হিন্দুতে আলিঙ্গন করলে হবে না। তাদের উভয়ের সঙ্গে উভয়েরই কোলাকুলি ও আলিঙ্গন করতে হবে। এতে কারো জাত যাবে না। এজন্যই নজরুল লিখেছিলেন,

ছুঁলেই তোর জাত যাবে?

জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া।

সমস্ত বনি আদমকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রাণের তাগিদে, সেই তীব্র আকুতি নিয়ে দেশজুড়ে সর্বধর্মীয় সম্প্রীতি স্থাপনের লক্ষ্যে আমরা "সকল ধর্মের মর্মকথা - সবার ঊর্ধ্বে মানবতা" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে হাজার হাজার সভা-সমাবেশ, সেমিনার, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, সর্বধর্মীয় সম্মেলন করেছি। ধর্মব্যবসায়ীদের ফতোয়াবাজি, নিন্দাবাদ, অপপ্রচার আর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে, শত নির্যাতন সহ্য করে, নিজেদের পকেটের টাকা খরচ করে আমরা এই সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি। আমাকে এজন্য ভয়াবহ মাশুল দিয়েত হয়েছে। আমার নিজ বাড়িতে বহুবার হামলা চালানো হয়েছে, বাড়ি-ঘর আগুনে ভস্মীভূত করে ফেলা হয়েছে, সবকিছু লুটপাট করা হয়েছে, আমাদের দুই ভাইকে গরু জবাই করা ছুরি দিয়ে জবাই করেছে ধর্মব্যবসায়ীদের অনুসারীরা। হামলা হয়েছে হেযবুত তওহীদের আরো বহু সদস্য-সদস্যার উপরও। আমাদের বিরুদ্ধে মুসলমান ধর্মব্যবসায়ীদের মধ্যে একটি অংশ ভাবছে আমরা বুঝি মানুষকে হিন্দু বানিয়ে ফেলছি। আবার হিন্দু ধর্মব্যবসায়ীদের মধ্যে একটি অংশ ভাবছে আমরা তাদেরকে মুসলমান বানাতে চাচ্ছি। কিন্তু না, আমরা এর একটাও চাচ্ছি না, বরং আমরা চাই আমরা সবাই এক সত্যের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হবো। আমাদের একজন স্রষ্টা, তিনি যে সিদ্ধান্ত দিবেন সেটাই সত্য, সেখানে অন্য কারো কথা চলবে না, কেবল এই স্বীকৃতিটুকুই আমরা চাই, এর ভিত্তিতে ঐক্য গড়ে তুলতে চাই।

জানি না কবে আমরা ধর্মের নামে দাঁড়িয়ে থাকা অধর্মের এই প্রাচীরকে ভাঙতে পারবো, তবে এটা জানি সত্যের মোহনায় একদিন সকল জাতি, ধর্ম, বর্ণের মানুষ এসে মিলিত হবেই হবে ইনশাল্লাহ। সেদিন পরাজিত হবে ইবলিস শয়তান, সেদিন আল্লাহর বিজয় হবে। আল্লাহর বিজয় মানেই মানবতার বিজয়।

“উগ্রবাদ মোকাবেলার পথ তুলে ধরছে হেযবুত তওহীদ”

ইলা ইয়াছমিন

যারা ইসলামের এই প্রকৃত ধারণাগুলো তুলে ধরবেন তাদেরকে অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। তারা কোন অবস্থান থেকে ধারণাগুলো উপস্থাপন করছেন, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। শুধু ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি, গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ বা ধর্মহীন নাস্তিক্যবাদী অবস্থান থেকে তুলে ধরলে হবে না, মানুষকে ইসলামের প্রকৃত ধারণাগুলো তুলে ধরতে হবে ইসলামের পক্ষ থেকে, ধর্ম দিয়েই মোকাবিলা করতে হবে। কেননা ধর্মের কথা বলেই, জেহাদের নাম দিয়েই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডগুলো ঘটানো হচ্ছে।
এটাকে বলা হয় পাল্টা আদর্শ (ঈড়ঁহঃবৎ ওফবড়ষড়মু) দিয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং এই কাজটা হতে হবে সম্পূর্ণ নিস্বার্থভাবে;

অত্যন্ত দুঃখজনক, দুর্ভাগ্যজনক, বেদনাদায়ক বাস্তবতা হচ্ছে, একবিংশ শতাব্দির জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুক্তিবোধ, জ্ঞানচর্চা, শিক্ষা, প্রযুক্তি ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের উচ্চতম পর্যায় এসে- যখন মানবাধিকারের বহু সনদ তৈরি হয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষতার বহু বিধান প্রচার করা হয়েছে, সেই আধুনিক চিন্তা-ভাবনার যুগে এসে আবার আমাদেরকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে হচ্ছে। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পর বাংলাদেশে সেই ৮০ থেকে ১০০ বছর আগের সংগঠিত হওয়া দাঙ্গার যুগ আবার এসে হাজির হয়েছে। প্রতিপক্ষের ঘর-বাড়িতে হামলা, ভিন্ন ধর্মীয়, ভিন্ন বিশ্বাসের, ভিন্ন দলের মানুষের উপরে আক্রমণ, বাড়িঘর লুট-পাট, ব্যবসা-বাণিজ্য লুট-পাট, নারীদের উপর নির্যাতন, উপাসনালয় ইত্যাদির উপর হামলা করা হচ্ছে। এগুলো কেন হচ্ছে?

প্রধানত দুটি সম্প্রদায় বাংলাদেশে বাস করে, হিন্দু আর মুসলমান। উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী। কেউ বলে আল্লাহ, কেউ বলে ভগবান। একদল শান্তির জন্য মসজিদে যায়, আরেকদল মন্দিরে যায়। কেউ কোর'আন পাঠ করে, কেউ গীতা পাঠ করে। কেউ লম্বা দাড়ি-জোব্বা পরে, কেউ টিকি, ধুতি, পৈতা, গেরুয়া বসন পরে। যে যার ধর্মাচার পালন করে। কিন্তু ধর্মের নামে এই অসহিষ্ণুতা, এই যে সংঘাত, এই যে সাধারণ মানুষের বলি হওয়া, এটা কেন হচ্ছে? বিদগ্ধজন, চিন্তাশীল, সমাজবিজ্ঞানী, সমাজ পরিচালক, ধর্মচিন্তক সকলের কাছে এটি একটি উদ্বিগ্ন হওয়ার বিষয়। আমরা হেযবুত তওহীদ মনে করি এর মূল কারণ ধর্মের নানাবিধ অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগ।

১. ইসলামের প্রকৃত ধারণা, প্রকৃত শিক্ষা, প্রকৃত আদর্শ, যেটা নবী করিম (সা.) প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন, যেটা ছিলো উদার, সহনশীল, সকল ধর্ম, মত ও সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে একত্রে বসবাস করার মত বৃহৎ - সেই প্রকৃত ইসলামের আকিদা আজ নেই। সেটা হারিয়ে গেছে।

২. ধর্মকে ইতিমধ্যে ধর্মব্যবসায়ী একটি শ্রেণি হাজার হাজার মত, পথ, ফেরকা-তরিকা, মাজহাব ইত্যাদি সৃষ্টি করে নানা কায়দায়, ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করছে, অর্থ রোজগার করছে। ধর্মকে তারা যার যার মত করে ব্যবহার করছে, ব্যাখ্যা দিচ্ছে যার অধিকাংশই ভুল ব্যাখ্যা, অপব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যা।

৩. একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ধর্মকে ব্যবহার করছে, ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করছে। এই রাজনৈতিক গোষ্ঠীটি নির্বাচনের প্রাক্কালে জনগণের সমর্থন পাওয়ার আশায় অথবা নির্বাচনে হেরে গেলে ক্ষোভ প্রকাশের জন্য ধর্মকে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।

৪. জঙ্গিবাদী, সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীটি কোর'আন-হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে নানা ধরনের ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সকল ক্ষেত্রেই মূলত মানুষের ঈমান হাইজ্যাক হয়ে যাচ্ছে, ভুল খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। ধর্মবিশ্বাস ইতিবাচক কাজের পরিবর্তে নেতিবাচক কাজে, সামাজবিধ্বংসী কাজে, মানবতাবিরোধী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে করে একটি বিরাট সংখ্যক শ্রেণির ধর্মের প্রতি আস্থা হারিয়েছে এবং হারাচ্ছে, ধর্মের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হচ্ছে বীতশ্রদ্ধ হচ্ছে। আরেকটি শ্রেণি অতি উগ্রবাদী ধর্মান্ধতে পরিণত হচ্ছে। তারা সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়নক হিসেবে নানা কায়দায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

সব মিলিয়ে পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ। সাম্রাজ্যবাদী অস্ত্রব্যবসায়ী পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলি এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতিকে ব্যবহার করছে। তারা অস্ত্রব্যবসা করে, মারণাস্ত্র বিক্রি করে তাদের অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করছে। কারণ তাদের অর্থনীতিই হলো যুদ্ধ অর্থনীতি। অস্ত্রব্যবসাই তাদের প্রধান ব্যবসা। তাই তারা নানাভাবে জঙ্গিবাদকে উৎসাহিত করছে এবং যে সমস্ত জায়গায় যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে সেসব জায়গায় দুই পক্ষের মুসলিমদের কাছেই অস্ত্র সরবরাহ করছে।

আমরা এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখলাম ইরাকে, সিরিয়ায়, মধ্যপ্রাচ্যে এবং সাম্প্রতিক আফগানিস্তানে। এখন সাধারণ মানুষ অত্যন্ত চিন্তিত, বীতশ্রদ্ধ। সামাজিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে মানুষ, কবে কখন কী থেকে কী হয়ে যায় কেউ বলতে পারে না। এ অবস্থায় তাদের করণীয় কী? কীভাবে এর থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে? সেই মুক্তির পথ আমাদের কাছে আছে। সেটার প্রস্তাব নিয়ে আমরা সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে গিয়েছি, সভা-সেমিনার করছি, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বদের জানিয়েছি। জনতা থেকে শুরু করে জননেতা সকলের কাছে আমরা প্রস্তাব দিচ্ছি যে, আজকের এই সমাজ হুমকির মুখে, মানবতা ধ্বংসের মুখে, সভ্যতা বিনাশের পথে; এমনকি ধর্মবিশ্বাসীরাও যার যার ধর্ম পালন করার ক্ষেত্রে আজ নিরাপদ নয়। এখনে সংবিধানের মূলনীতি লঙ্ঘিত হচ্ছে, মানবতার ঘোষণা অকার্যকর হচ্ছে, আন্তর্জাতিক আইনও লঙ্ঘন করা হচ্ছে, প্রত্যেকটা মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে। এক্ষেত্রে একটা মাত্র করণীয়, সেটা হচ্ছে: ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা, প্রকৃত ধারণা, প্রকৃত আদর্শ মানুষের সামনে তুলে ধরা। জনগণের সামনে সুস্পষ্ট বার্তা দেওয়া যে এটা প্রকৃত ইসলাম নয়। এ ধরনের অন্যায়, দলবাজী, ধর্মব্যবসা, স্বার্থ হাসিল, অপরাজনীতি, উগ্রবাদ - এগুলো কোনোভাবেই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা হতে পারে না। কীভাবে নয় তা কোর'আন হাদিস থেকে তুলে ধরে মানুষকে দেখাতে হবে।

যারা ইসলামের এই প্রকৃত ধারণাগুলো তুলে ধরবেন তাদেরকে অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। তারা কোন অবস্থান থেকে ধারণাগুলো উপস্থাপন করছেন, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। শুধু ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি, গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ বা ধর্মহীন নাস্তিক্যবাদী অবস্থান থেকে তুলে ধরলে হবে না, মানুষকে ইসলামের প্রকৃত ধারণাগুলো তুলে ধরতে হবে ইসলামের পক্ষ থেকে, ধর্ম দিয়েই মোকাবিলা করতে হবে। কেননা ধর্মের কথা বলেই, জেহাদের নাম দিয়েই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটানো হচ্ছে।

এটাকে বলা হয় পাল্টা আদর্শ (Counter Ideology) দিয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং এই কাজটা হতে হবে সম্পূর্ণ নিস্বার্থভাবে; কোনো কায়েমী স্বার্থবাদীর উদ্দেশ্য বা এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য নয়, কোনো সরকারের পক্ষে সাফাই গাওয়ার জন্য নয়। এমন কিছু করলে মানুষ আর উদ্বুদ্ধ হবে না। যারা এটা তুলে ধরবেন তাদের নিজেদেরকেও অবশ্যই সত্যের উপর, ন্যায়ের উপর দণ্ডায়মান থাকতে হবে। তা না হলে তাদের অবস্থান প্রশ্নবিদ্ধ হবে। সেই লক্ষ্যে হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী সুস্পষ্ট কতগুলো নীতিমালার উপরে এ আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেছেন। যারা সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে চায়, যারা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তারা শুধু মানবতার কল্যাণে হেযবুত তওহীদে অঙ্গিকারাবদ্ধ হবে। হেযবুত তওহীদের মূলনীতিগুলো হচ্ছে-

১. হেযবুত তওহীদ আল্লাহর রসুলের গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করবে।

২. হেযবুত তওহীদের কোনোরূপ গোপন কার্যক্রম থাকবে না, সবকিছু হবে প্রকাশ্য, স্পষ্ট, দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

৩. কেউ কোনো আইন ভঙ্গ করবে না, অবৈধ অস্ত্রের সংস্পর্শে যাবে না, গেলে তাকে এমাম নিজেই আইনের হাতে সোপর্দ করবেন।

৪. শ্রেণি-পেশা, ধর্ম-বর্ণ, দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে যথাসম্ভব সঙ্গে নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করবে।

৫. যারা হেযবুত তওহীদের সদস্য বা সমর্থক নয় তাদের কাছ থেকে আন্দোলন পরিচালনার কাজে কোনো অর্থ গ্রহণ করা হবে না।

৬. হেযবুত তওহীদের কোনো সদস্য প্রচলিত স্বার্থভিত্তিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে পারবে না।

৭. কর্মক্ষম কেউ বেকার থাকবে না, বৈধ উপায়ে উপার্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

৮. দীনের কাজ করে কেউ কোনোরূপ বিনিময় গ্রহণ করতে পারবে না, বিনিময় নিবে আল্লাহর কাছ থেকে। ইসলামের কাজ হবে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে, মানবতার কল্যাণে।

৯. অন্য ধর্মের ব্যাপারে কোনো বিদ্বেষমূলক আচরণ করবে না।

এই অঙ্গীকার গুলো মেনে হেযবুত তওহীদ সংগ্রাম করছে। কাজেই আমরা জোর গলায় বলতে পারি, হেযবুত তওহীদের কাছেই একমাত্র সেই আদর্শ আছে যা মানুষকে যাবতীয় সংকট থেকে উদ্ধার করতে পারে। হেযবুত তওহীদ লক্ষ লক্ষ সভা-সমাবেশ করে, সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে, সকল দলমত, পথের লোকদেরকে নিয়ে এই ধর্মান্ধতা, জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। একটি উদাহরণ দিচ্ছি-

ধর্মান্ধ, ধর্মব্যবসায়ীরা নারীদের কোনো অধিকার স্বীকার করতে

চায় না। তারা নারীদেরকে সেই প্রাচীন যুগের মত গৃহবন্দি করে রাখতে চায়। নারীদের কোনো শিক্ষা, প্রগতি, যোগ্যতায়, অভিজ্ঞতায়, জ্ঞান, সাহস, প্রজ্ঞায়, অংশগ্রহণকে তারা স্বীকৃতি দিতে চায় না। কিন্তু হেযবুত তওহীদ মনে করে নারীরাও এই সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সভ্যতা নির্মাণে নারীদেরও অধিকার রয়েছে। নারীদের যোগ্যতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা রয়েছে। নারীরা সেনাবাহিনীতে দুর্দান্ত ভুমিকা রাখতে পারে। প্রকৃত ইসলামের যুগে, অতীতে, মধ্যযুগে যুদ্ধের ময়দানের মত বিপদসঙ্কল পরিবেশে নারীরা ভুমিকা রেখেছে, রাষ্ট্র পরিচালনায় নারীরা যোগ্যতার সাক্ষর রেখেছে এবং বর্তমানের আধুনিক যুগেও রাখছে। আজও সমাজ নির্মাণে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে, পরিবার পরিচালনা ও পারিবারিক শান্তি রক্ষায়, নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকাই মুখ্য।

ইসলামের যিনি প্রবর্তক, সেই নবী (সা.) নারীদের এই যোগ্যতাকে প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন। তিনি নারীদেরকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে গেছেন। হজ্জের ময়দানে, জুমার নামাজে, হাসপাতাল পরিচালনায়, বাজার ব্যবস্থাপনাসহ সকল ক্ষেত্রেই নারীদের দিপ্ত পদচারণা ও সাহসী ভূমিকা ছিল। রণাঙ্গনে নারীরা কমান্ডারের দায়িত্ব পর্যন্ত পালন করেছেন। কাজেই নারীদের এই যোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ হেযবুত তওহীদ উগ্রপন্থীদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে গত ২৬ বছর ধরে সভা-সেমিনার, পথসভা, র‍্যালি, মানববন্ধন, পত্রিকা প্রকাশ, ব্যবসা-বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রে শালীনতার সঙ্গে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে। এই কাজ করতে গিয়ে হেযবুত তওহীদ ধর্মান্ধদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। ফলে নারীদের উপর হামলাও হয়েছে একাধিকবার।

কাজেই এই চলমান উগ্রতার বিরুদ্ধে একমাত্র করণীয়, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা জনগণের সামনে তুলে ধরা। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাদেরকে সেই আদর্শ দিয়েছেন। আমরা চিন্তাশীল, আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন, যুক্তিবোধ সম্পন্ন সকল মানুষকে বলতে চাই, ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তির ধর্ম, ইসলাম উন্নতি, প্রগতির ধর্ম, ইসলাম সাম্যের ও মুক্তির ধর্ম। একদা ইসলাম মানবজাতিকে সভ্যতা উপহার দিয়েছিল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আজ যেই উন্নতি-প্রগতি, এই অবস্থার ভিত রচনা করেছিলেন মুসলমানেরা। কাজেই ইসলামে অন্ধত্বের জায়গা নেই, কূপমণ্ডুকতার জায়গা নেই, ধর্মান্ধতার জায়গা নেই, উগ্রবাদের জায়গা নেই, নারীদের হেয় করার কোনা জায়গা নেই, সঙ্গীতকে অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করার কোনো জায়গা ইসলামে নেই। বর্তমানে আমরা ইসলাম হিসাবে যেটা দেখছি সেটা ঐ সংকীর্ণমনা ধর্মব্যবসায়ীদের সৃষ্টি করা বিকৃত ইসলাম। এটা প্রকৃত ইসলাম নয়। আমাদের বক্তব্য শুনলে আশা করি আপনাদের কাছে তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আজকে সারা পৃথিবীতে এই যে ইসলামোফোবিয়া সৃষ্টি করে দেওয়া হচ্ছে, এক্ষেত্রে প্রধানত দুটো জিনিস দায়ী। (১) ইসলামের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র, (২) মুসলমানদের ধর্মান্ধতা ও ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি। এই বাড়বাড়ি ইসলামে নিষিদ্ধ। এই বাড়াবাড়ি যারা করে তারা অবশ্যই মানবতার শত্রু। আমরা বলবো ইসলাম সম্পর্কে জানুন! হেযবুত তওহীদের বক্তব্য জানুন এবং বুঝুন!

ধর্মব্যবসার ফাঁদে

মানবতার কল্যাণে আগত শেষ জীবনব্যবস্থা ইসলামকে ব্যবহার করে কোনোরূপ স্বার্থ উদ্ধারের সুযোগ নেই।

ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্মব্যবসা কী?

ধর্মব্যবসায়ী কারা?

ধর্মব্যবসা জাতির কী ক্ষতি করছে?

যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়, দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তি চায় তাদের জন্য এ বইটি পড়া অত্যন্ত জরুরী।

পড়ুন এবং জানুন।

তওহীদ প্রকাশন

যোগাযোগ: ০১৬৭০১৭৪৬৪৩ | ০১৭১১০০৫০২৫

বইটি পড়তে কিউআর (QR) কোড স্ক্যান করুন।

মদিনা সনদ এক জাতিসত্তা গঠনের শিক্ষা

আদিবা ইসলাম

মদিনা সনদের একটি পৃষ্ঠা যা আজও গবেষকদের কৌতুহল ও গবেষণার বিষয়বস্তু।

মদিনা শব্দের অর্থ হচ্ছে শহর। ইয়াসরিব নামের ছোট্ট কৃষিপ্রধান গ্রামটির একটি ঐতিহাসিক শহরে পরিণত হওয়ার গল্পটা কিন্তু সাধারণ কোনো নগরায়ণের গল্প নয়। এর পেছনে রয়েছে এক মহান আদর্শের উত্থান যা একটি সভ্যতার ভিত্তি রেখেছিল ইয়াসরিব গ্রামের মাটিতে। সেই ইতিহাস লেখা হয়েছিল বহু মানুষের রক্ত ও ঘামের অক্ষরে। কী অপরিসীম ত্যাগ-তিতীক্ষা, শ্রম ও লড়াই করতে হয়েছিল সেই সভ্যতার নির্মাতাদের, তা বর্ণনা করতে গিয়ে বিগত ১৪শ' বছরে লক্ষ লক্ষ বই রচনা করা হয়েছে। আজও মানুষ যখন আদর্শিক সংকটে পড়ে তখন মদিনার দিকে চোখ ফেরায়।

এই সভ্যতার নায়ক ছিলেন শেষ নবী বিশ্বনবী মোহাম্মদ (সা.)। মক্কায় যখন তিনি নির্যাতিত নিপীড়িত সাহাবিদের নিয়ে কঠিন সময় পার করছেন তখন রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে মদিনায় যাওয়ার ডাক এলো। যুগ যুগ ধরে মদিনার গোত্রগুলো একে অপরের শত্রু হিসাবে বসবাস করে আসছিল। তাদের মধ্যে কেউ বিকৃত দীনে হানিফের অনুসারী, কেউ ইহুদি, কেউ বা খ্রিস্টান। এদের মধ্যে বড় দুটো গোত্র ছিল আউস ও খাজরাজ। তাদের মধ্যে কয়েক বছর আগেই ঘটে গেছে রক্তক্ষয়ী বুয়াস যুদ্ধ। অতি সাধারণ তুচ্ছ কারণে গোত্রে গোত্রে লড়াই বেঁধে যেত আর বংশপরম্পরায় সেই যুদ্ধ চলতে থাকত। ঠিক গত একশ' বছর ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলিমরা যেমন একই সংস্কৃতি, একই ভাষা, খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত, একই আবহাওয়ায় লালিত হওয়া সত্ত্বেও শত শত বার তারা দাঙ্গায় লিপ্ত হয়েছে। যাহোক, এরই মধ্যে মক্কায় একজন নবীর আবির্ভাব হয়েছে এমন বার্তা তাদের কানে পৌঁছালো। হজ্জ করতে গিয়ে অনেকে সরাসরি রসুলাল্লাহর সাক্ষাৎ পেলেন

এবং আকৃষ্ট হলেন। তাদের মধ্যে এমন আশা জাগ্রত হলো যে, এই নবীকে যদি মদিনায় নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে মদিনার এতদিনকার গোত্রীয় বিবাদ ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের একটা সুরাহা হবে। আল্লাহর ইচ্ছাও এমনটাই ছিল।

রসুলাল্লাহ মদিনায় গেলেন। প্রথমেই তিনি সেখানে মসজিদ নির্মাণ করলেন যা কিছুদিনের মধ্যেই শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো। এই মসজিদটি সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাঁড়িয়ে গেল। সেখানে সকল ধর্মের অনুসারীদের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। এটাই ছিল রসুলাল্লাহর কার্যালয়। তিনি মদিনার সকল গোত্রের সঙ্গে আলাদা আলাদা করে বসলেন। নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বললেন। ইহুদি গোত্রগুলোর সঙ্গেও বসলেন। মদিনার ইহুদি গোত্রগুলো আসলে পূর্ব থেকেই একজন নবীর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল। কারণ তাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে এমন কথাই বলা হয়েছিল। কিন্তু তাদের বিশ্বাস ছিল যে নবী আসবেন ইহুদিদের মধ্যে। বাস্তবে নবী ইসমাইল (আ.) এর বংশে আসায় তারা মন থেকে তাঁকে মেনে নিতে পারছিল না। তথাপি নবীজি যখন তাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন, তাঁর বক্তব্য ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অনেক ইহুদিই ইসলাম গ্রহণ করলেন। রসুলাল্লাহ তখন মুসলিম অমুসলিম সকল গোত্রের সঙ্গে একটি লিখিত চুক্তি করলেন। এই চুক্তির নাম মদিনা সনদ। এই চুক্তি ছিল মূলত একটি মৈত্রী ও নিরাপত্তা চুক্তি (Peace and security agreement)।

ভিন্ন মত, ভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা তাদের সাধারণ স্বার্থে (Common Interest) ঐক্যবদ্ধভাবে সমাজে বাস করবে এটাই ছিল চুক্তিটির মূল লক্ষ্য। সাধারণ স্বার্থ বলতে প্রধানত দুটো বিষয়- মদিনার অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে শহরকে রক্ষা করা। অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল সকলে মিলে একজন নেতার আনুগত্য করা। এটাই হচ্ছে সার্বভৌমত্ব বা (Sovereignty), যা যে কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রথম মৌলিক উপাদান। একজন অবিসংবাদিত নেতা (Indivisible, absolute, supreme legitimate authority) জাতির মধ্যে থাকতেই হবে যার ফায়সালা হবে চূড়ান্ত, তার সিদ্ধান্তই ন্যায়সঙ্গত বলে সকলকে মানতে হবে। মদিনা সনদে সকল গোত্র রসুলাল্লাহকে (সা.) তাদের এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদাতা হিসাবে, বিচারক হিসাবে মেনে নিল। এর মাধ্যমেই তারা বিবাদমান কিছু গোত্র থেকে একটি উম্মাহ বা জাতিসত্তায় পরিণত হলো। রসুলাল্লাহ মসজিদে বসে তাদের মধ্যকার বিবাদগুলো আল্লাহর হুকুম দিয়ে মীমাংসা করে দিতে লাগলেন। এভাবে ন্যায়বিচারক নেতা হিসাবে তিনি আস্থা অর্জন করলেন। তখনকার মসজিদ কিন্তু বর্তমানের মসজিদের মতো নির্জীব, নিষ্প্রাণ, দিনের অধিকাংশ সময় তালা ঝুলানো উপসনালয় ছিল না। সেই মসজিদ ছিল আজকের দিনের সচিবালয়ের মতো, সেনাঘাঁটির মতো, বিদ্যালয়ের মতো কর্মব্যস্ত, প্রাণবন্ত। যাহোক, সম্পূর্ণ চুক্তিটির উদ্ধৃতি এখানে দিতে গেলে লেখা বড় হয়ে যাবে, শুধু প্রধান প্রধান শর্তগুলো পেশ করছি।

(ক) মদিনা শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে ইহুদি ও মোশরেকরা মুসলিমদের সঙ্গে একত্র হয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

(খ) যুদ্ধে ইহুদি ও মোশরেকরা তাদের নিজেদের খরচ বহন করবে, মুসলিমরা নিজেদের খরচ বহন করবে, যত দিনই যুদ্ধ চলুক।

(গ) চুক্তির অংশীদার গোত্রগুলোর লোকজন রসুলাল্লাহর (সা.) অনুমতি ছাড়া কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না।

(ঘ) এই চুক্তির অধীন সমস্ত গোত্রগুলির মধ্যে যেকোন প্রকার বিরোধ বা গণ্ডগোল যাই হোক না কেন সমস্ত বিচার মহানবীর (সা.) কাছে হতে হবে।

এই কয়টিই হল মহানবীর (দ.) ও মদিনার ইহুদি-পৌত্তলিক, খ্রিস্টানদের মধ্যে চুক্তির প্রধান প্রধান (Salient) বিষয়, যে চুক্তিটাকে মদিনার সনদ বলা হয়। চুক্তির ঐ প্রধান প্রধান বিষয়গুলির দিকে মাত্র একবার নজর দিলেই এ কথায় কারো দ্বিমত থাকতে পারে না যে, নিজ আদর্শের বিষয়ে বিন্দুমাত্র ছাড় না দিয়েও মহানবী (দ.) এমন একটি চুক্তিতে ইহুদি ও মোশরেকদের আবদ্ধ করলেন- যে চুক্তির ফলে তিনি কার্যত (De Facto) মদিনার ইহুদি ও মোশরেকদের নেতায় পরিণত হলেন। এখানে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, এই চুক্তিতে আসার ক্ষেত্রে কোনো পক্ষকে কোনোপ্রকার চাপ সৃষ্টি বা ভয়ভীতি প্রদর্শন, জোর জবরদস্তি কিংবা প্রলোভন দেখানো হয় নি। তারা স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। নবী করিম (সা.) ও তাঁর সাহাবিরা সামগ্রিক পরিস্থিতি তাদের সামনে তুলে ধরে এই চুক্তির প্রয়োজনীয়তা, সুবিধা ইত্যাদি বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাদের নিজেদের যুদ্ধের খরচ নিজেরা বহন করে মহানবীর (দ.) অধীনে মুসলিমদের সঙ্গে একত্র হয়ে যুদ্ধ করার, মহানবীর (দ.) বিনা অনুমতিতে কারো সঙ্গে যুদ্ধ না করার ও নিজেদের মধ্যকার সমস্ত রকম বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারের ভার মহানবীর (দ.) হাতে ন্যস্ত করার শর্তে আবদ্ধ করে তিনি যে চুক্তি করলেন তা নিঃসন্দেহে একাধারে একটি রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামরিক বিজয় যা আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার নিরীখেও অত্যন্ত প্রশংসিত হয়ে থাকে। ঐ চুক্তির ফলে মদিনার নিরাপত্তার ব্যবস্থা তো হলই, তার উপর তিনি কার্যত মুসলিম-অমুসলিম সকলের নেতায় পরিণত হলেন।

মদিনায় সকল ধর্মের মানুষ তাদের ধর্মপালনের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করত। যারা মূর্তিপূজারী তারা মূর্তিপূজা করত। ইহুদিরা তাদের প্রথানুসারে উপাসনা করত। মদিনায় কোনো একজন ব্যক্তিকেও তার ধর্মপালনে বাধা দেওয়া হয়েছে, কিংবা কাউকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায় না। উপরন্তু রসুলাল্লাহ ইহুদিদের বিচার করার সময় তাদের গ্রন্থের বিধান দিয়েই করতেন। খন্দকের যুদ্ধে যখন বনি কোরায়জার ইহুদিরা চুক্তি লংঘন করে শত্রুদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল তখন তাদের এই যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য তিনি বিশেষ আদালত (Special Tribunal) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এই আদালতে রসুলাল্লাহ নিজে বিচার না করে ইহুদিদের পছন্দনীয় বিচারক সাদ বিন মা'আজকেই (রা.) নিযুক্ত করেছিলেন। সাদ বিন মা'আজ (রা.) তওরাতের বিধান (Penal Code) দিয়েই বনি কোরায়জার যুদ্ধাপরাধীদের দণ্ড প্রদান করেছিলেন। অর্থাৎ আদালতের বিচারক পছন্দ করার এখতিয়ারও আসামিপক্ষকে দেওয়া হয়েছে, যা এই আধুনিক যুগেও নজিরবিহীন।

ধর্মোন্মাদনা সৃষ্টি করে, গুজব রটনা করে, হুজুগ তুলে দিয়ে কোনো একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর উপর হামলেপড়ার কোনো নজির রসুলাল্লাহর জিন্দেগিতে কেউ দেখাতে পারবে না। অথচ আমাদের সমাজের এক শ্রেণির ধর্মীয় নেতারা সুযোগ পেলেই সংখ্যালঘুদের মন্দির, উপাসনালয়, মাজার ভাঙচুর করার উস্কানি দেন। যার পরিণামে ক্ষিপ্ত মুসল্লি ও উগ্রবাদী ধর্মান্ধরা হিংস্র হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে স্থানীয়ভাবে দুর্বল শ্রেণিটির উপর। তাদের বাড়িঘর দোকানপাট লুট করে, আগুন জ্বালিয়ে ভস্মিভূত করে দেয়, সুযোগ পেলে তাদের নারীদের ধর্ষণ করে। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হচ্ছে, এই সমস্ত অপকর্মকে ইসলামের মোড়ক পরিয়ে জেহাদ বলে, নবীর সম্মান রক্ষার আন্দোলন বা কোর'আন অবমাননার প্রতিবাদ বলে চালিয়ে দেওয়া হয়।

প্রশ্ন হচ্ছে এগুলো কি আল্লাহর রসুলের শিক্ষা! আল্লাহর রসুল তো মদিনায় আগত ভিন্নধর্মী মানুষের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন, তাদেরকে আতিথেয়তা করেছেন। কোনো বিষয় নিয়ে মতবিরোধ হলে সত্য প্রমাণের জন্য মোবাহেলার আয়োজন পর্যন্ত করেছেন। বিধর্মী বন্দীরা বন্দীদশায় ইসলামের সৌন্দর্য দেখে দীন গ্রহণ করেছে, এমন ঘটনাও প্রচুর ঘটেছে। আজকের মুসলিম কি সেই ইসলামের অনুসারী? নাকি আজকের মুসলিম ধর্মব্যবসায়ীদের ফতোয়ায় চালিত কলের পুতুল হয়ে নিজেরাই আল্লাহ, রসুল, কোর'আন ও ইসলামের ঘোরতর অবমাননায় লিপ্ত?

প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে কেউ যদি সত্যিই ইসলামের অবমাননা করে তার বেলায় কী করণীয়। সেই প্রশ্নের উত্তর কোর'আনেই দেওয়া আছে, নবীর জীবনীতেও পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমত, অপরাধ যাচাই করা, কেননা অন্যকে ফাঁসানোর জন্য অনেক সময় ঘটনা সাজানো হয়। এজন্য আল্লাহ ঘোষণা করলেন, হে মো'মেনগণ! যদি কোন অবাধ্য ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও (সুরা হুজরাত-৬)। আর আল্লাহর রসুল (সা.) বলেছেন, কোনো মানুষের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যাই শোনে তাই যাচাই না করেই অন্যের কাছে বর্ণনা করে দেয় (মুসলিম)।"

দ্বিতীয়ত, আল্লাহর হুকুম হলো যে কোনো সংবাদ শোনামাত্র প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে সেটা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবগত করা। কর্তৃপক্ষ সে বিষয় সম্পর্কে তদন্ত (Investigation) করে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী যা করণীয় তা করবেন। পবিত্র কোর'আনে ইরশাদ হচ্ছে, "যখন শান্তি অথবা শংকার কোনো সংবাদ তাদের কাছে আসে তখন তারা সেটাকে প্রচার করতে শুরু করে। যদি তারা বিষয়টি রসুলাল্লাহ কিংবা তাদের মধ্যে যারা আদেশ দানের অধিকারী (আমীর) তাদের গোচরে আনত, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা সংবাদের যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত। তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত তবে তোমাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলে শয়তানের অনুসরণ করত।" (সুরা নিসা ৮৩)।

এ আয়াতে সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, যারা কোনো সংবাদ যাচাই না করে সিদ্ধান্ত নেয় তারা শয়তানের অনুসরণ করে। কোর'আনে এমন দ্ব্যর্থহীন নির্দেশনা ও শৃঙ্খলা লিপিবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও যারা গুজবে বা উড়ো কথায় বিশ্বাস করে প্রচার চালায় এবং এর উপর ভিত্তি করে কোনো অপরাধমূলক ঘটনা ঘটিয়ে দেয় তাদের বিষয়ে ইসলামের কঠোর দণ্ডবিধি রয়েছে। আর দণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলামে পক্ষপাতিত্বের কোনো সুযোগ নেই। গুজব রটনাকারী মুসলিম হলে বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হলেও সেজন্য বিচারের ক্ষেত্রে কোনো ছাড় পায় না।

এগুলো সবই ইতিহাস। আজ ইসলাম বললে আমাদের মনে ভেসে ওঠে নামাজ, রোজা, দাড়ি, টুপি, সাদা পাঞ্জাবি, মেয়েদের বোরকা, ঈদের কোলাকুলি ইত্যাদি। কিন্তু ১৪শ' বছর আগের মদিনায় ইসলাম বলতে মানুষ বুঝতো ন্যায়বিচার, শান্তি, নিরাপত্তা, মানবাধিকার, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি সমাজ। আজ যদি ইসলামের সেই দৃষ্টান্তগুলো আমাদের সমাজে দেখতে চাই, তাহলে প্রথম কর্তব্য হলো, ফেরকা মাজহাব, দলমত, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবাইকে যে কোনো একজন নেতার নিঃশর্ত আনুগত্য মেনে নেওয়া, ঠিক যেমনটা হয়েছিল মদিনায়। এটাই ছিল মদিনা সনদের মূল শিক্ষা।

ধর্ম অবমাননার জবাবে ইসলামের শিক্ষা

আয়েশা সিদ্দিকা

আয়েশা সিদ্দিকা, কেন্দ্রীয় যুগ্ম নারী বিষয়ক সম্পাদক, হেযবুত তওহীদ

ইসলাম ধর্মের অবমাননা কোনো মুসলিমই সহজে মেনে নিতে পারবে না এটা স্বাভাবিক। কারণ আমরা মুসলিমরা রসুলকে নিজেদের প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি, কোর'আনকে পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে পবিত্র বস্তু বলে বিবেচনা করি। যদি কেউ মুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের উদ্দেশ্যে এর অসম্মান করে, তাহলে অবশ্যই তার প্রতিবাদ হওয়া উচিত। আমাদের দেশেও প্রতিবাদ হয়, কিন্তু সেই প্রতিবাদের ভাষা কতটা ইসলাম সম্মত, রসুলাল্লাহর সুন্নাহ সম্মত সেটা আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয়।

কিছুদিন পর পর আমাদের দেশে কোর'আন 'অবমাননা'র অভিযোগকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন জেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দির, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, দোকানপাটে হামলা করে ভাঙচুর চালায় ক্ষিপ্ত জনতা। সব সময়ে দেশে একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন মতাদর্শের স্বার্থবাদী রাজনৈতিক দল ওঁৎ পেতেই থাকে। তারাও সুযোগ পেয়ে এ জাতীয় সন্ত্রাসের আগুনে ঘি ঢালে। দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, এগুলো সবই করা হয় ধর্মের নামে। ভারতে হয় হিন্দু ধর্মের নামে, আর বাংলাদেশে ইসলামের নামে। এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বৃহত্তর শান্তিপ্রিয় শান্তিকামী ধর্মপ্রাণ উপাসকদের বাইরেও বর্তমানে একটি উগ্রবাদী গোষ্ঠীর প্রাবল্য সৃষ্টি হয়েছে। তারাই নানারকম ইস্যু সৃষ্টি করে, সেগুলো রাজনৈতিক গোষ্ঠীর হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মাঝখান থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ নিরীহ মানুষ।

উপরন্তু উভয়ধর্মের মধ্যেই পশ্চিমা বস্তুবাদী, নাস্তিকতাবাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ধর্মবিদ্বেষী শ্রেণিরও উদ্ভব হয়েছে, যারা প্রতিনিয়ত ধর্মের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে বেড়ায়। তাদের মধ্যে ইসলামবিদ্বেষী যে গোষ্ঠীটি সারা বছর ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ায় তারা এ ধরনের ইস্যুকে ব্যবহার করে নানা ধরনের বক্তব্য, ঘৃণাসূচক পোস্ট অনলাইনে প্রচার করে। ফলে মানবজাতির কাছে ইসলাম সম্পর্কে ভয়ানক নেতিবাচক বার্তা যায় যে, ইসলাম একটি সন্ত্রাসের ধর্ম, ইসলাম পরমতসহিষ্ণু নয়, আধুনিক সভ্যযুগে সভ্য মানবসমাজে ইসলাম খাপ খায় না, মুসলিমরা সন্ত্রাসী, মুসলিমরা জঙ্গি, মুসলিমরা পাশবিক, বর্বর, নৃশংস ইত্যাদি।

কিন্তু শান্তির ধর্ম ইসলামের নাম ব্যবহার করে যারা এই যে হিংসা ও সন্ত্রাসের চর্চা করে চলছে- তারা কি আদৌ রসুলাল্লাহর অনুসারী? যারা রসুলকে ভালোবাসেন, ইসলামকে ভালোবাসেন

তাদের সামনে মহানবীর গৃহীত কর্মনীতি আলোচনা করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। চলুন দেখি তিনি এ জাতীয় ঘটনার ক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ নিয়েছেন।

ঘটনা ১. মসজিদে প্রশ্রাবকারী ব্যক্তির প্রতি আচরণ

আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, একবার এক বেদুইন মসজিদে নববীতে পেশাব করে দিল। লোকেরা তা দেখে তেড়ে এল। কিন্তু রসুলাল্লাহ (সা.) তাদেরকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, তাকে তার কাজ শেষ করতে দাও এবং এক বালতি পানি ঢেলে স্থানটি ধুয়ে দাও। মনে রেখ, তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে জীবনকে সহজ করার জন্য, কঠিন করার জন্য নয় (হাদিস- বোখারি, কিতাবুল ওজু ১/৩৫)। এরপর রসুলাল্লাহ লোকটিকে শান্তভাবে বুঝিয়ে বললেন যে মসজিদ আল্লাহর ঘর, এখানে সালাহ কায়েম করা হয়। এটা পবিত্র স্থান। এখানে এই কাজ করা উচিত নয়। আরববাসীর অজ্ঞতা সম্পর্কে রসুলাল্লাহ সচেতন ছিলেন। তাই এ বিষয় নিয়ে অন্যান্য সাহাবিদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়াতে দিলেন না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে হস্তক্ষেপ করে সুন্দর ও স্বাভাবিক সমাধান করে দিলেন।

পক্ষান্তরে আজকে যদি এ ধরনের ঘটনা কেউ ঘটায় তাহলে মসজিদ কর্তৃপক্ষ বা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এর সমাধান দেওয়ার আগেই স্বার্থান্বেষী ঐ গোষ্ঠীটি গুজব ছড়িয়ে দিত। ফলে তার কপালে কী ঘটবে তা সহজেই অনুমেয়। প্রমাণ- মাত্র কিছুদিন আগে লালমনিরহাটে জুয়েল নামে একজন নির্দোষ ব্যক্তির উপর কোর'আন অবমাননার অভিযোগ এনে শেষ পর্যন্ত তাকে পিটিয়ে হত্যা তো করাই হয়েছিল, তারপর তার মরদেহ আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল পাশবিক উল্লাসে। কিন্তু বেচারার দোষ ছিল এটাই যে, মসজিদের উঁচু তাক থেকে কোর'আন নামাতে গিয়ে একটি কোর'আন মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। বেচারা হাজার বার কোর'আনে চুমু খেয়েও, পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়েও রক্তপিপাসু উন্মাদদের হাত থেকে বাঁচতে পারল না। এই মানুষগুলো আসলেই কি সেই নবীর অনুসারী যিনি অজ্ঞ বেদুইনকে মসজিদের ভিতরে অমন কাজ করতে দেখেও বিন্দুমাত্র ক্ষিপ্ত হন নি? তারা কি আসলেই মহানবীর আদর্শ ধারণ করেছেন? রসুলাল্লাহ তো জেহাদ করেছেন সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য, এবং সেই জেহাদের একটা সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও কর্মসূচি ছিল। তাঁর জেহাদ ছিল বহুগুণ শক্তিশালী শক্তির বিরুদ্ধে। তিনি তো দুর্বল অসহায় মানুষের বিরুদ্ধে শক্তিপ্রদর্শন করেন নি।

ঘটনা ২. মোনাফেক সর্দারের দাফন অনুষ্ঠানে রসুলাল্লাহ (সা.)

মক্কায় ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশমন ছিল আবু জাহেল আর মদিনায় সবচেয়ে বড় দুশমন ছিল মোনাফেক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল। এই দুজনের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন উবাই ছিল বেশি ভয়ানক, কারণ সে প্রকাশ্যে নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করত, মসজিদে গিয়ে জামাতে সালাহ কায়েম করত, সকল আলোচনার মধ্যেও উপস্থিত থাকতো, এমন কি জেহাদের আয়োজনেও অংশ নিত। কিন্তু এর পাশাপাশি মো'মেনদের একতা আর মনোবলে ভাঙন ধরানোর জন্য সে সারাক্ষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো। রসুলাল্লাহর হাত থেকে মদিনার নেতৃত্ব কেড়ে নেওয়াই ছিল তার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন। ওমর (রা.) সহ অনেক সাহাবি, এমন কি তার নিজের ছেলেও তাকে হত্যা করার জন্য নবীজির কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেছেন, কিন্তু রসুলাল্লাহ অনুমতি দেন নি। তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন যাতে করে আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের ভণ্ডামির মুখোশ আপনা থেকেই খসে পড়ে আর তার অনুসারীরা তাদের নেতার কদর্যতার পরিচয় লাভ করতে পারে। তিনি বলেছেন, "যদি আমি তাকে হত্যা করি তাহলে লোকেরা বলবে, দেখ, মোহাম্মদ (সা.) তার সঙ্গীদেরকে কীভাবে হত্যা করেছে।"

এহেন মোনাফেক সর্দার যখন মারা গেল রসুলাল্লাহ তার দাফনকার্যে যোগদান করলেন। তিনি যখন সেখানে পৌঁছান ততক্ষণে তাকে কবরে নামানো হয়ে গেছে। তিনি তার লাশ কবর থেকে বের করার নির্দেশ দেন। এরপর তার লাশ স্বীয় হাঁটুর ওপর রাখেন, নিজের মুখের পবিত্র থুথু তার শরীরে লাগিয়ে দেন এবং নিজের পরিধেয় জামা তাকে পরিয়ে দাফন করেন। (হাদিস- বোখারি, কিতাবুল জানাইয ১/১৮২)

এই ছিল রসুলাল্লাহর সহিষ্ণুতার মাত্রা। আজ যারা রসুলাল্লাহর উম্মত দাবি করে ভিন্নধর্মের বা ভিন্নমতের মানুষের উপর পৈশাচিক উন্মত্ততায় হামলে পড়ছে, সর্বোচ্চ ক্ষতিসাধনের জন্য আঘাত হানছে, তাদের সামনে মহানবীর এই সহনশীলতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার উদাহরণ তুলে ধরা অতি জরুরি।

রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা মন্দ ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, তা জঘন্য মিথ্যা। তোমরা একে অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করবে না, একে অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াবে না, প্রতারণা করবে না, পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ রাখবে না, একে অন্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাবে না; বরং আল্লাহর বান্দা হিসেবে সকলে ভাই ভাইয়ে পরিণত হবে। -হাদিস বোখারী ২/৮৯৬

ঘটনা ৩. ইহুদি ধর্মব্যবসায়ীর দুর্ব্যবহারের জবাব

যায়েদ নামের এক ইহুদি রাব্বাই মহানবীর সাথে একটি অগ্রিম কেনা-বেচা করল। নির্ধারিত সময়ের ২/৩ দিন পূর্বেই সে এসে মাল পরিশোধের দাবি করল। এমনকি চাদর মোবারক টেনে নবীজির সঙ্গে বেয়াদবি করল। বিকৃত

চেহারায় রূঢ় কণ্ঠে নবীজীর দিকে তাকিয়ে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে চিনি। তোমরা আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর, বড় টালবাহানাকারী।'

সেখানে উপস্থিত ছিলেন ওমর ফারুক (রা.)। নবীজীর সাথে লোকটির এ অশিষ্ট আচরণ দেখে তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে ধমক দিলেন। কিন্তু রসুলাল্লাহ ওমরকে (রা.) বললেন, ওমর! আমি ও এ ব্যক্তি তোমার থেকে অন্যরূপ আচরণ পাবার হকদার ছিলাম। দরকার তো ছিল তুমি আমাকে সত্বর তার প্রাপ্য আদায় করার পরামর্শ দিতে, আর তাকে কথায় ও আচরণে নম্রতা অবলম্বনের তাগিদ দিবে। এরপর তিনি ওমরকে (রা.) প্রাপ্য পরিশোধের নির্দেশ দেন এবং তাকে আরো ২০ সা বেশি খেজুর দিতে বলেন, যা ছিল ওমর (রা.) কর্তৃক লোকটিকে ধমক দেওয়ার বদলা। খেয়াল করুন, ভিন্ন ধর্মের লোককে সামান্য একটা ধমক দেওয়াও রসুলাল্লাহ বরদাশত করলেন না।

মহানবীর এ সহিষ্ণু আচরণ লোকটির ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়। যাওয়ার পথে যায়েদ ওমরকে (রা.) বললেন, হে ওমর! আমি হচ্ছি ইহুদি-আলেম যায়েদ ইবনে সানা। আসলে লেনদেন আমার উদ্দেশ্য ছিল না, বরং মহানবীর ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা পরীক্ষা করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। কারণ শেষ নবীর অন্যতম গুণ হবে এই যে, **তাঁর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ক্রোধের ওপর প্রবল থাকবে।** যতই রূঢ় আচরণ করা হবে তার ক্ষমা ততই বৃদ্ধি পাবে। অতএব ওমর! আমি যা চেয়েছি তা পেয়ে গেছি। এরপর তিনি নবীজি (সা.) এর হাতে খালেসভাবে ঈমান আনেন এবং তাঁর অঢেল সম্পদের অর্ধেক উম্মতের জন্য দান করে দেন। (-মুসনাদে আহমদ, ৩/১৫৩, আখলাকুন্নাবী পৃ. ১২৪)

রাসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সহনশীলতার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে সহনশীলতা অবলম্বনের শক্তি দান করবেন, আর সহনশীলতা থেকে অধিক উত্তম ও ব্যাপক কল্যাণকর বস্তু আর কিছুই কাউকে দান করা হয়নি।' (হাদিস- বোখারি ও মুসলিম)

ঘটনা ৪. চাচার কলিজা ভক্ষণকারীকে ক্ষমা

হামজা (রা.) ছিলেন রসুলাল্লাহর প্রাণপ্রিয় চাচা এবং অভিভাবক। ইসলামে প্রবেশের পর যিনি অনেক জেহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ওহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর শাহাদাতের পর রসুলাল্লাহ এত কেঁদেছিলেন যে, অন্য কোনো জানাযায় তাঁকে এমন কাঁদতে দেখা যায়নি। আবু সুফিয়ানের প্রতিহিংসাপরায়ণ স্ত্রী হিন্দা নিজে হামজা (রা.)-এর পেট চিরে তাঁর কলিজা বের করে চিবায়। এমন বর্বর পৈশাচিক কাজ করার পরও রসুলাল্লাহ মক্কা বিজয়ের পর আবু সুফিয়ানের স্ত্রীকে ক্ষমা করে দেন। হিন্দার আগের জীবন এবং কর্ম নিয়ে রসুলাল্লাহ কখনোই তাকে কটাক্ষ করেননি।

রসুলাল্লাহ বলেন, 'যে তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তার সাথে তুমি মিলে যাও, যে তোমার ওপর জুলুম করে তাকে ক্ষমা করে দাও, যে মন্দ আচরণ করে, তার সাথে সদাচরণ কর।'

ঘটনা ৫. বিষ প্রয়োগকারীকে ক্ষমা

খায়বারে ইহুদিদের শোচনীয় পরাজয়ের পর জয়নব বিনতে তাহারাত নামের এক ইহুদি রমণী ভেড়ার গোশত রান্না করে রসুলাল্লাহকে দাওয়াত করেন । রসুলাল্লাহ (সা.) এবং বশির বিন বারা (রা.) খাওয়া শুরু করেন। খাবার মুখে দিয়েই রসুলাল্লাহ (সা.) বিষ দেওয়া হয়েছে বুঝতে পেরে তা ফেলে দেন, কিন্তু বশির (রা.) বিষক্রিয়ায় কয়েকদিন অসুস্থ থাকার পর মৃত্যুবরণ করেন। নবীজি জয়নবকে এ কাজের কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল, "আপনি রাজা বা বাদশাহ হলে বিষক্রিয়ায় মারা যাবেন আর আমরা মুক্তি পাব, আর যদি নবী হন তাহলে আল্লাহ আপনাকে জানিয়ে দেবেন।"

আল্লাহর রসুল বললেন, "আল্লাহ তোমাকে আমায় হত্যা করার ক্ষমতা দেননি।" রসুলাল্লাহর হৃদয় ক্ষমার বিশালতায় আবৃত, তিনি জয়নবকেও ক্ষমা করে দেন। কিন্তু বশির (রা.)-কে হত্যার অপরাধে জয়নবকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এ ঘটনায় রসুলাল্লাহ নিজের উপর করা হত্যাচেষ্টার অপরাধকে ক্ষমা করে দেন এবং বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁর সাহাবির হত্যাকারীর ফায়সালা করেন। কিন্তু একজনের অপরাধে পুরো গোত্রকে দোষী সাব্যস্ত করেন নি।

ঘটনা ৬. কন্যার জীবন বিপন্নকারীকে ক্ষমা

হাব্বার ইবনে আসওয়াদ রসুলাল্লাহর কন্যা জয়নাবকে (রা.) হিজরতের সময় এমন জোরে ধাক্কা মেরেছিল যে তিনি উটের হাওদা থেকে ছিটকে পাথুরে প্রান্তরে গিয়ে পড়ে যান। এতে তার গর্ভপাত হয়ে যায়। মক্কা বিজয়ের পরে হাব্বার ইবনে আসওয়াদ ইসলাম গ্রহণ করেন, রসুলাল্লাহ (সা.) তাকেও ক্ষমা করে দেন।

ঘটনা ৭. বেদুইনের অসভ্য আচরণের প্রতিক্রিয়া

আব্বাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুলাল্লাহ একদিন নাজরানের চাদর পরিহিত ছিলেন, যার প্রান্তদেশ ছিল মোটা। পথে এক বেদুইন আরবের সাথে দেখা হতেই সে নবীজির চাদর ধরে এত জোরে টান দিল যে তাঁর গলায় দাগ

পড়ে গেল। এরপর সে বলল, "আল্লাহর যে মাল আপনার কাছে রয়েছে তা আমাকে দেওয়ার হুকুম দিন।" রসুলাল্লাহ তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন এবং তার প্রার্থিত বস্তু তাকে দেওয়ার জন্য বললেন। (হাদিস বোখারী, কিতাবুল জিহাদ)

ঘটনা ৮. মক্কাবিজয়ের দিন সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা

রসুলাল্লাহকে কাফের কোরাইশদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে জন্মভূমি মক্কা থেকে হিজরত করতে হয়েছিল। আট বছর পর তিনি আবার ১০ হাজার সাহাবিকে নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। এ অভিযানে আল্লাহ তাঁকে বিনা যুদ্ধে বিজয় দান করেন। তিনি কাবাঘরে প্রবেশ করে মানব স্রোতের সামনে ভাষণ দেন– "আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুমদাতা নেই, তিনি এক অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি তাঁর ওয়াদা সত্যি করে দেখিয়েছেন। তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সব বিরুদ্ধশক্তিকে পরাজিত করেছেন।"

এরপর জিজ্ঞেস করলেন, "হে কোরাইশগণ! তোমাদের কী ধারণা, আমি তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করব বলে তোমরা মনে করো?"

সবাই বলল, "আপনি ভালো ব্যবহার করবেন এটাই আমাদের ধারণা, আপনি দয়ালু ভাই, দয়ালু ভাইয়ের পুত্র।"

রসুলাল্লাহ (সা.) বললেন, তাহলে আমি তোমাদের সে কথাই বলছি যে কথা ইউসুফ (আ.) তাঁর ভাইদের বলেছিলেন, "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, তোমরা মুক্ত।" ইতিহাস সাক্ষী হয়ে রইল, যে মানুষটির উপর ও তাঁর অনুসারীদের উপর সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে, বিনা উস্কানিতে তেরটি বছর দিনে রাতে লোমহর্ষক অত্যাচার চালানো হয়েছে, আজ তিনি পূর্ণ প্রতিশোধের ক্ষমতা পেয়েও চরম শত্রুকে ক্ষমা করে দিলেন। উম্মাহর জন্য কেয়ামত পর্যন্ত তিনি সহনশীলতার এই দৃষ্টান্ত, এই সুন্নাহ তিনি স্থাপন করে গেলেন।

রসুলাল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহর পথে আমাকে যতটুকু ভয় দেখানো হয়েছে, ততটুকু অন্য কাউকে দেখানো হয়নি। আল্লাহর পথে আমাকে যতটুকু নির্যাতিত করা হয়েছে, ততটুকু অন্য কাউকে করা হয়নি। একবার ত্রিশটি দিবা-রাত্র আমার এমন অতিবাহিত হয়েছে, যখন আমার ও বেলালের জন্যে এমন কোনো আহার্য বস্তু ছিল না, যা কোনো প্রাণী খেতে, সেই বস্তু ছাড়া, যা বেলাল তার নিকটে লুকিয়ে রেখেছিল। (মা'আরিফুল হাদীস; শামায়েল)।

এ ধরনের ক্ষমা, উদারতা, সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতার শত শত উদাহরণ মহানবীর পবিত্র জীবনী থেকে দেওয়া যায়। তিনি জেহাদ করেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অধিকারবঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, নিপীড়িত মানুষকে রক্ষা করার জন্য, মানুষের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিকসহ সর্বরকমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। জনমনে ত্রাস সৃষ্টি করা তাঁর জেহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাই মহানবীর প্রকৃত উম্মত হিসাবে আমাদের কর্তব্য হবে যাচাই বাছাই না করে কোনো প্রচারণায় কান না দেওয়া, একের অপরাধে অন্যের ক্ষতিসাধন না করা, কেউ অপরাধ করলে কেবল তাকেই বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দণ্ডিত করা।

ইসলাম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ‘আসাবিয়াহ’ শেখায়নি

আসাদ আলী

সাম্প্রদায়িকতা মানবজাতির জীবনে একটি অভিশাপের নাম। ধর্মের নামে বিভক্তির যে শক্ত দেওয়াল মানবজাতিকে বহু ভাগে বিভক্ত করে রেখেছে তার মূল শক্তিকেন্দ্র এই সাম্প্রদায়িকতা। কিন্তু নবী-রসুল অবতারগণ ঘৃণা বিস্তার করতে ধরার বুকে আবির্ভূত হন নি, তারা এসেছিলেন ঘৃণা বিদ্বেষ লুপ্ত করতে, কিন্তু তাঁদের অনুসারীরা দুঃখজনকভাবে তাদের নামেই ঘৃণা বিদ্বেষের প্লাবন বইয়ে দিয়েছে ধরার বুকেই।

বর্তমান সময়টিতে ধর্ম বিশ্ব রাজনীতির প্রধান ইস্যু। অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে, সময়ের প্রয়োজনেই মানুষ যখন একে অপরের সঙ্গে মিলিত হতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে তখন বিভিন্ন অনুসারীদের মগজের মধ্যে বিরাজিত সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি তাদেরকে পৃথক করে রেখেছে। যার দায় স্বভাবতই গিয়ে পড়ছে ‘যত দোষ নন্দ ঘোষ’ সেই ধর্মের ঘাড়ে। আমরা দেখছি যে একজন মানুষকে তার যোগ্যতা দিয়ে নয়, তার ধর্ম দিয়েই বিশেষায়িত করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে মুসলিম সাহিত্যিক বা হিন্দু শিক্ষক। মানুষের ‘মানুষ’ পরিচয় গৌণ হয়ে যাচ্ছে ধর্মীয় পরিচয়ের আড়ালে। কিন্তু একজন মুসলমান সর্বপ্রথমে একজন মানুষ, তারপরে সে মুসলমান। একইভাবে একজন হিন্দুও সর্বপ্রথমে একজন মানুষ, তারপরে সে হিন্দু। তাই সে কোনোভাবেই এক ধর্মের অনুসারী অন্য কোনো ধর্মের অনুসারীর উপর হামলা চালাতে পারে না। কারণ মানুষ হিসাবে তারা একে অপরের ভাই, তারা এক পিতা-মাতার সন্তান।

সাম্প্রদায়িকতা কী?

অভিধানে ইংরেজি Communalism শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে সাম্প্রদায়িকতা। ইংরেজি মেরিয়াম ওয়েবস্টার ডিকশনারি ইংরেজি শব্দ কমিউনালিজমকে সংজ্ঞায়িত করেছে Loyalty to a sociopolitical grouping based on religious or ethnic affiliation. এই অভিধানিক সংজ্ঞা অনুসারে কমিউনালিজম বা সাম্প্রদায়িকতাকে নেতিবাচক হিসেবে বিবেচনা করা হয় নি। বরং কোন বৃহৎ সমাজের অন্তর্গত নিজস্ব গোত্র বা গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্যকে সাম্প্রদায়িকতা বলা হয়েছে। কিন্তু এই সংজ্ঞা তো আমাদের দেশের প্রচলিত সংজ্ঞা বা বাস্তবতার সঙ্গে যায় না। তাই আমাদেরকে দেখতে হবে আমাদের নিজস্ব শব্দ ও সংজ্ঞার দিকে। এখানকার সমকালীন চিন্তায় সাম্প্রদায়িকতার দ্বিতীয় অর্থ রয়েছে। কী সেটা?

গোটা ভারতবর্ষেই সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার এখন মুসলমানদের কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। বিশিষ্ট মার্কসবাদী তাত্ত্বিক বদরুদ্দীন উমরের ভাষায় ‘সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে এক ধরনের মনোভাব। কোন ব্যক্তির মনোভাবকে তখনই সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যা দেওয়া হয় যখন সে এক বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্তির ভিত্তিতে অন্য এক ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচারণ এবং ক্ষতিসাধন করতে প্রস্তুত থাকে’।

এ সংজ্ঞার আলোকে বোঝা গেল, সম্প্রদায় চেতনা আর সাম্প্রদায়িকতা এক না। সম্প্রদায় চেতনা থেকে নিজ সম্প্রদায়ের পরিচয়ে পরিচিত হতে চাওয়া, তাদের ভালোবাসাকে সাম্প্রদায়িকতা বলে না। কিন্তু তা যখন অপর সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ আর হিংসা হিসেবে বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন সেটাই হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা। নিজ দলের অন্যায়কেও সমর্থন করা আর অপর দলের ন্যায্য অধিকারকে অস্বীকার করাই সাম্প্রদায়িকতা। বর্তমানে আমাদের গণতান্ত্রিক-সাম্যবাদী রাজনৈতিক দলগুলো হিন্দু-মুসলিম, শিয়া-সুন্নী, ক্যাথলিক-প্রোটেস্টেন্টদের মত একেকটি সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে। এমন কি ক্রিকেট খেলা নিয়েও ভারত বিরোধিতা, পাকিস্তান বিরোধিতা, রবীন্দ্র-নজরুল নিয়েও সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়ানো খুব স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ব্রিটিশ যুগের ‘ভাগ করে শাসন করো’ নীতি

আমাদের উপমহাদেশে এই হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষটা সৃষ্টি করে গেছে ব্রিটিশ শাসক শ্রেণি। তারা শাসনব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে এই বিভক্তি ও শত্রুতাকে জাতির মনে মগজে গেড়ে দিয়ে গেছে, হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা বাধিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত ঝরিয়েছে। তারা তাদের পরিকল্পনা অনুসারে সর্বপ্রথম দুই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার প্রণয়ন করে যার ফলে তারা জাতিকে ভাগ করো, শাসন করো (Divide and Rule) নীতি অনুসারে দু’ভাগে ভাগ করে দিতে পারে। তারা এরই ধারাবাহিকতায় মুসলমানদের জন্য কলকাতা আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন যার প্রথম ছাব্বিশজন প্রিন্সিপাল ছিল খ্রিস্টান ও হিন্দুদের জন্য সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। ইংরেজদের আগমনের অব্যবহিত পূর্বে ভারতবর্ষ মুসলমান মুঘলদের শাসনাধীন ছিল। তখন ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষভাব ছিল না।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এ বিষয়টি বিশদভাবে "ব্রিটিশ যুগেই এই ঘটনার সূচনা। তার আগে সম্প্রদায় ছিল, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। ব্রিটিশ আমলে হিন্দু মধ্যবিত্ত শিক্ষায় ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠায় উঠতি মুসলিম মধ্যবিত্তের তুলনায় অন্তত পঞ্চাশ বছর এগিয়ে ছিল। মুসলিম মধ্যবিত্ত দেখল জায়গা তেমন খোলা নেই, অন্যরা দখল করে নিয়েছে। শুরু হলো দু'পক্ষের প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যারা দখল করে রেখেছে তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। শাসক ব্রিটিশরা এ ব্যাপারে দু'পক্ষকেই উস্কানি দিল যাতে তাদের রেষারেষিটা আরো বাড়ে। বাড়লে ব্রিটিশের সুবিধা, কেন না ঝগড়াটা তখন শাসক-শাসিতের থাকবে না, হয়ে দাঁড়াবে হিন্দু-মুসলমানের।" [প্রতিদিনের সংবাদ ১৭ জুলাই ২০১৬]

ইসলামের দৃষ্টিতে গোত্রপ্রীতি

ইসলামের দৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িকতা একটি নিকৃষ্ট মনোভাব। এর আরবি হচ্ছে আসাবিয়াত। আসাবিয়াত মানে কী এই প্রশ্ন করলে রসুলাল্লাহ বলেন, "অন্যায় কাজে স্বগোত্র-স্বজাতির পক্ষে দাঁড়ানো" (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৫০৭৮)। তদানীন্তন আরবে গোত্রীয় সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল, বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ও ছিল। তবে সাম্প্রদায়িকতা বিষয়টি গোত্রগুলোর মধ্যেই বেশি ক্রিয়াশীল ছিল। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে একটি গোত্র আরেক গোত্রের বিরুদ্ধে শতবর্ষী যুদ্ধ চালিয়ে যেত।

অন্য একটি হাদিসে আল্লাহর রসুল বলেন, "যে ব্যক্তি মানুষকে আসাবিয়াতের দিকে আহ্বান করবে (অর্থাৎ অন্যায় কাজে নিজ দেশ, দল, গোত্র, জাতিকে সাহায্য করতে বলবে) সে আমাদের দলভুক্ত নয়। যে এমন সাম্প্রদায়িক লড়াইয়ে মৃত্যুবরণ করবে সেও আমাদের দলভুক্ত নয় (মুসলিম নয়) (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৫০৮০)।

সুতরাং সাম্প্রদায়িকতা বিষয়টি কোনোভাবেই ইসলাম বা হিন্দু ধর্মের শিক্ষা নয়, এর সুগভীর রাজনৈতিক অসদুদ্দেশ্য রয়েছে। সেটা উপলব্ধি না করার দরুনই আজ আমাদের হিন্দু-মুসলিম ধর্মগুরুরা তাদের বক্তৃতায় অন্য ধর্মের প্রতি বিষোদগার করে সস্তা জনপ্রিয়তা আর অর্থ উপার্জন করে থাকেন। এর পরিণামে জাতির মনে মগজে কী বিভক্তির বিষ তারা প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছেন আর তার সুদূরপ্রসারী কুফল কী সেটা উপলব্ধি করার মতো বোধশক্তি তাদের নেই। তাদের এই অপকর্মের ফলেই জাতির একটি বড় অংশ উগ্র ধর্মান্ধতায় আক্রান্ত, তাদেরকে যেই বলা হয় অমুক সম্প্রদায়ের লোক ইসলামের অবমাননা করেছে অমনি তারা যাচাই বাছাই না করে হিংস্র পশুর আক্রোশ নিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবে প্রায়ই আমাদের দেশে হিন্দুদের পল্লীতে, বৌদ্ধদের মন্দিরে হামলা হয়, হতাহত হয়, আগুনে বাড়ি ঘর ভস্মীভূত হয়। ঠিক একই ঘটনা যেখানে মুসলমান সংখ্যালঘু সেখানে মুসলমানদের উপরও হয়। ভারতে হিন্দুত্ববাদী সরকারের ছত্রছায়ায় গোরক্ষা আন্দোলনের নামে বহু মুসলমানকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে, মায়ানমারে মুসলমান পরিচয়ের অপরাধে হাজার হাজার রোহিঙ্গাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে জাতিগত নিধন চালিয়ে দেশ থেকে উৎখাত করে দিয়েছে শান্তির অবতার গৌতম বুদ্ধের অনুসারীরা। শান্তি নোবেল বিজয়ী অং সাং সুচি এই গণহত্যার বিরুদ্ধে মুখও খোলেন নি। সম্প্রতি ভারতের বিজেপি নেত্রী নূপুর শর্মার ইসলামবিদ্বেষী বক্তব্য থেকে সারা মুসলিম বিশ্বে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে এবং এদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। এই ইস্যুতে নড়াইলের একজন শিক্ষককে লাঞ্ছনা করা হয়। ওদিকে ভারতের উগ্রবাদী মুসলিমরা প্রতিবাদের নামে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। মুসলিমদের উপরও নেমে আসে দাঙ্গার খড়্গ। কোরবানিতে গরু জবাই নিয়ে সেখানে মুসলমানরা প্রচণ্ড ভীতিকর অবস্থায় পড়ে যান।

এই রকম অন্যায় যেন দানা বাঁধতে না পারে সে জন্য আল্লাহর রসুল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াতেই নিষেধ করেছেন। কেননা বিদ্বেষ একটা সময়ে বেড়ে উঠে এমন পর্যায়ে চলে যায় যখন তা দাঙ্গায় রূপ নেয়, দাঙ্গা থেকে শুরু হয় যুদ্ধ মহাযুদ্ধ।

বিশ্ব রাজনৈতিক অঙ্গনে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা

বর্তমানে যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখে আমরা বসে আছি সেটাও মূলত সেই পাশ্চাত্যের মুসলিমবিদ্বেষী মনোভাব তথা সাম্প্রদায়িকতারই পরিণতি। তারা টার্গেট নিয়েছে, লক্ষ্য স্থির করেছে যে মুসলিমদের ধরাপৃষ্ঠে রাখবে না, তাদের কোনো নিজস্ব মতামত থাকবে না, ধর্ম থাকবে না, সংস্কৃতি থাকবে না, জীবনবিধান থাকবে না, দেশও থাকবে না। তাদের বিশ্বনেতারা এ ধরনের কথা প্রকাশ্যে অনেকে বলে থাকেন অনেকে কলাকৌশলপূর্ণ শব্দের খোলস পরিয়ে একই সাম্প্রদায়িক ঘৃণার অভিব্যক্তি প্রকাশ করে থাকেন। দুই তিনটা উদাহরণ দেই:

ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, 'পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে মুসলিম সম্প্রদায়কে মঙ্গল গ্রহে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।' এ ব্যাপারে তিনি বিজ্ঞানী ইলন মাস্ককে প্রস্তাব দেন, যদি তিনি তার রকেটে করে মুসলিমদের মঙ্গলে পাঠিয়ে দিতে পারেন, তা হলে তাকে তার সরকারের পরিবহন মন্ত্রীর পদ দেবেন। (১৮ জুন ২০১৬, দৈনিক ইত্তেফাক)।

আফগানিস্তান হামলার প্রাক্কালে এই আগ্রাসনকে জর্জ বুশ ক্রুসেড হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেন, This crusade, this war on terrorism is going to take a while. অর্থাৎ আসন্ন ক্রুসেড, আসন্ন সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধটি সমাপ্ত হতে কিছুটা সময় লাগবে (বিবিসি, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০১)।

বৌদ্ধদের ধর্মীয় গুরু অং সুংঙ্গা পং বলেন, "শুধু বর্মানে হামলা নয়, প্রয়োজনে বাংলাদেশে আমাদের পুরানো ভূমি উদ্ধারে হামলা করা হবে। বাংলাদেশের ফেনী পর্যন্ত আমাদের পুণ্য মাতৃভূমি। সুযোগ পেলে উদ্ধারে নেমে পড়বো।"

কথিত সুশীলদের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি

আমাদের শিক্ষিত সেক্যুলার ধ্যান-ধারণার লোকেরাও কিন্তু সাম্প্রদায়িক চিন্তার উর্ধ্বে যেতে পারছেন না। তারাও পশ্চিমাদের চশমা পরে ইসলামের বিরুদ্ধে, মুসলমানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন এবং নিজেদের মুসলিম নাম পরিচয় নিয়ে নিদারুণ হীনম্মন্যতায় ভুগছেন। তাদের সাম্প্রদায়িক মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই যখন তারা সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় বাছ বিচার পরিহার করে মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রায় ধর্মের সকল ইতিবাচক ভূমিকাকেই অস্বীকার করেন এবং ধর্ম মানেই অচ্ছুত, পরিত্যাজ্য, জঘন্য এমন ভাব প্রকাশ করেন। এটাও এক প্রকার অন্ধত্ব। তাছাড়া দেশে ও বিদেশে নির্যাতিত জনগোষ্ঠী মুসলিম হলে সেই নির্যাতনের বিরুদ্ধে নীরব ও নিশ্চেষ্ট থাকা পক্ষান্তরে নির্যাতিতরা সংখ্যালঘু, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, সাঁওতাল বা নির্দিষ্ট ধর্মহীন সুফিবাদী, বাউল সম্প্রদায় হলে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠাও সাম্প্রদায়িক মানসিকতার প্রকাশ। নির্যাতিত মুসলিমদের পাশে দাঁড়ালে পাছে গায়ে মুসলিম তকমা লেগে যায় এজন্য তারা অন্যান্য সকল নির্যাতনের প্রতিবাদ করলেও মুসলিম নির্যাতনের বিরুদ্ধে পারতপক্ষে নিশ্চুপ।

এখন কী করণীয়?

এই ভয়াবহ সাম্প্রদায়িকতার আগুনে আজ মানবজাতি জ্বলে পুড়ে অঙ্গার হচ্ছে, কিন্তু এ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য কোনো পথ তাদের সামনে নেই। মাথা ব্যথা হলে মাথা কেটে ফেলার মত একটি দল বলছে ধর্মকেই বাদ দিতে হবে। কিন্তু সেটা আদৌ সম্ভব হয়নি, হবেও না। রাশিয়ার বহু মসজিদ গির্জা ভেঙে ফেলা হয়েছিল স্ট্যালিনের যুগে কিন্তু এখন তাদের প্রেসিডেন্ট পুতিন খোদ মস্কো শহরের বুকে এশিয়ার সবচেয়ে বড় মসজিদটি নির্মাণ করেছেন। ধর্মকে বাদ না দিয়ে তারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

অন্যান্য ধর্মের কথা বাদ দিলাম, আল্লাহর পক্ষ থেকে আবির্ভূত সর্বশেষ রসুল ও সর্বশেষ কেতাবের অনুসারী মুসলিমরা কী করে সাম্প্রদায়িক হলো সেটা কিছুতেই বুঝে আসে না। এই বিদ্বেষ ও ঘৃণা বিস্তারের শিক্ষা তারা কোথায় পেল? আল্লাহ-রসুলকে নিয়ে কেউ কটূক্তি করলে একজন ঈমানদার মানুষের রক্তে আগুন ধরে যাবে এটা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু সেই আগুন জ্বালিয়ে এমন কিছু করা মুসলিমের সাজে না যার দরুন তার নিজ ধর্মের অপমান হয়, নিজ নবীর অপমান হয়। আল্লাহর রসুল তো আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তাঁকে গালি দেওয়া হলে কী করতে হবে সেটাও আমাদেরকে তাঁর জীবনী থেকেই শিখতে হবে। তিনি কী করেছেন, আল্লাহ কী বলেছেন এ বিষয়ে সেটা একটু দেখা যাক।

আল্লাহর রসুলকে গালি দেওয়া তো নতুন কিছু নয়। তাঁর জীবদ্দশাতেও তাঁকে মক্কার কাফেররা বহু গালিগালাজ করেছে, তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যাচার, গুজব রটনা করেছে। কিন্তু এসবের বিরুদ্ধে রসুলাল্লাহ কি কাফেরদের বাড়িঘরে আগুন দিয়েছেন, তাদেরকে হামলা করে বা গোপনে হত্যা করেছেন? না। তাঁরা কেবল আল্লাহকে একমাত্র হুকুমদাতা হিসাবে মেনে নেওয়ার জন্য মানুষকে আহ্বান করে গেছেন। আরবরা তাদের গোত্রপতিদের হুকুম মানতো। একটা পর্যায়ে তিনি ঐ একটি কথার উপর আরবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। তখন মুসলমানদের শক্তির সামনে মাথা তোলার মত আর কেউ অবশিষ্ট ছিল না আরবে, নবীজীকে গালি দেওয়ার হিম্মতও ছিল না কারো।

সুতরাং মুসলিমদেরও এখন একটাই কর্তব্য, আল্লাহর তওহীদের স্বীকৃতি যারাই দেবে অর্থাৎ যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে তাদেরকে নিয়ে একটি শক্তিশালী জাতিসত্ত্বা গড়ে তোলা, শিয়া-সুন্নী, হানাফি-হাম্বলি, গণতান্ত্রিক-সাম্যবাদী, আরব-অনারব ইত্যাদি মনগড়া বিভক্তির দেওয়াল ভেঙে ফেলা, নিজেরা হানাহানি না করে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। তাহলেই কেউ আর আল্লাহ-রসুলের বিরুদ্ধে কটূক্তি করতে সাহস করবে না।

আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে বলেছেন, "তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাসনা করে তোমারা তাদেকে গালি দিও না। কারণ এতে তারাও সীমালংঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দিবে।" (সুরা আল-আন'আম ১০৮)। আল্লাহ তাদেরকে উপেক্ষা করতে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, "তাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা জানেন। তাই হে নবী, আপনি তাদের শাস্তি দেয়ার বিষয়টি উপেক্ষা করুন, তাদের উপদেশ দিন এবং তাদের কাজের পরিণতির কথা স্পষ্টভাবে বলে দিন (সুরা নিসা ৬৩)।

ধর্ম অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনের দ্বারস্থ হওয়া। যতদিন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম আছে ততদিন আইন নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া একটি বিশৃঙ্খল জাতির লক্ষণ।

যারা ইসলামবিদ্বেষী তাদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে যৌক্তিক জবাব দিতে হবে, হামলা করে জ্বালাও পোড়াও হত্যাকাণ্ড করলে সেটা ইসলামের নীতিবিরুদ্ধ হবে, ইসলামেরই বদনাম হবে, মানুষ ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে চলে যাবে। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন, হে নবী! আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্য, উত্তম যুক্তিপূর্ণ উপদেশ দিয়ে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায়। (সুরা নাহল ১২৫)।

আদম (আ.) থেকে শেষ নবী পর্যন্ত আগত প্রতিটি ধর্মই ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠীর হাতে পড়ে বিকৃত হয়ে গেছে। যে ধর্মগুলো ছিল একত্ববাদী, সেগুলো হয়ে গেছে পৌত্তলিকতায় পূর্ণ। তাদের কথা কোর'আনে এসেছে। একইভাবে বিকৃত হয়ে যাওয়া ইহুদি খ্রিস্টান ধর্মগুলোর কথাও এসেছে। আল্লাহ এই সব ধর্মের সকল অনুসারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দেন নি। তিনি বলেছেন, "যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আল্লাহর পথে তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, কিন্তু সীমালঙ্ঘন কর না, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীকে ভালবাসেন না" (সুরা বাকারা: ১৯০)। ইসলামের লড়াই মূলত অন্যায়ের বিরুদ্ধে। যেখানে অন্যায় অবিচার বিরাজিত থাকবে সেখানেই উম্মতে মোহাম্মদী ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে যাবে। এখানে কে সেই অন্যায়ের ধ্বজাধারী সেটা বিবেচ্য নয়, সে হিন্দু হোক, খ্রিস্টান হোক এমন কি মুসলিম দাবিদারই হোক।

আল্লাহর রসুল সব ধর্মবিশ্বাসের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে তাদের উদ্দেশে বলেছেন, হে আহলে-কেতাবগণ! এমন একটি বিষয়ের দিকে এসো- যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান- যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন শরিক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে প্রতিপালক বলে মানবো না। তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, "সাক্ষী থাক আমরা তো মুসলিম।" (সুরা ইমরান ৬৪)। অর্থাৎ তোমরা যদি না ও আসো, আমরা তওহীদের সাক্ষ্য দিলাম। এর পর অন্য ধর্মের লোকদের জীবনযাপনকে নিরাপদ করা ও তাদের উপাসনার অধিকারকে সংরক্ষণ করাও ইসলামের আদর্শ।

এখন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প থেকে জাতিকে মুক্ত করতে প্রয়োজন এ সম্পর্কে ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরা। মানুষকে এটা বোঝাতে হবে যে প্রসিদ্ধ সকল ধর্মই একই স্রষ্টার পক্ষ থেকে এসেছে। তাদের ধর্মপ্রবর্তকদের মধ্যেও বহু সত্য নবী-রসুল রয়েছেন। তাদের কেতাব ও শিক্ষাগুলো আজকে বিকৃত হয়ে গেলেও গোড়ায় সেগুলো আল্লাহরই কেতাব ছিল। এখন তো ইসলামের চর্চাও সম্পূর্ণ বিকৃত ও বিপরীতমুখী হয়ে গেছে। সুতরাং সবাইকে আবার "সকল ধর্মের মর্মকথা-সবার উর্ধ্বে মানবতা" এই চরম সত্যটিকে স্বীকার করে নিয়ে এক পরিবারভুক্ত হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু-নজরুলের চেতনা ও হেযবুত তওহীদ

রুফায়দাহ পন্নী

পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল জাতির ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস রয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমরা নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে চরম অজ্ঞতায় নিমজ্জিত। ষড়যন্ত্র করে আমাদের গৌরবের ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিজেদের সম্পর্কে একটা হীনম্মন্যতা, ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে। যারা বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে জানেন না তারা হয়তো বুঝতে পারবেন না বাংলাদেশের জন্য কতখানি সংগ্রাম দেশবাসী করেছে। সুজলা সফলা শস্য শ্যামলা এই দেশের ইতিহাস এটা বলেনা যে বাঙালিরা কোথাও সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে, অন্য জাতিকে দাস বানিয়েছে, লুটপাট করেছে, শোষণ করেছে। তাদের প্রয়োজন পড়েছে অন্য কোথাও যাওয়ার। কারণ পৃথিবীর বুকে এই ভূখণ্ডের চেয়ে উর্বর জমি খুব কমই আছে। এর উপর দিয়ে বয়ে গেছে শত শত নদী-নালা, খাল-বিল। এদেশের মাটিতে বীজ ফেললে এমনিতেই ফসল ও ফল ফলাদি হয়। এদেশের সন্তানেরা মায়ের কোলকে যেমন ভালোবেসেছে, ভালোবেসেছে তার মাটিকেও। তাই বারবার এই বাংলাকে আক্রমণ করা হয়েছে।

এই পাক ভারত উপমহাদেশে পন্নী পরিবারের ইতিহাস হাজার বছরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। পন্নী পরিবারের পূর্ব পুরুষেরা আফগান পাঠান ছিলেন। তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই ভূখণ্ডে এসেছিলেন হাজার বছর আগে। দেশের মাটি সকলের কাছেই অত্যন্ত পবিত্র। আমরা মুসলিম হিসেবে এই মাটিতে সেজদা করি। এই মাটির ফল ও ফসল খেয়ে আমরা বড় হয়েছি। তাই আমাদের জানা প্রয়োজন, এই দেশের সমৃদ্ধি ও তা রক্ষার ক্ষেত্রে পন্নী পরিবারের পূর্বপুরুষদের কী ভূমিকা ছিল।

পন্নী পরিবার পুরুষাণুক্রমে টাঙ্গাইলের করটিয়ার জমিদারি করেছেন। তাঁদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন গৌড়ের স্বাধীন সুলতান। আজকে সুলতানি যুগও নেই, জমিদার প্রথাও নেই। ব্রিটিশ সরকারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কবলে পড়ে পুরাতন মুসলিম জমিদাররা তাদের জমিদারি হারাতে বাধ্য হন। জমিদার শব্দটি শুনলেই আজ আমাদের মনে একটি নেতিবাচক ধারণা চলে আসে। আর আসাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী পন্নী জমিদাররা দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের জমিদারদের মত ভোগবিলাসী, নির্যাতনকারী জমিদার ছিলেন না। বাংলাদেশের স্বাধীনতার অন্যতম নায়ক, মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে যাঁর পা ছুঁয়ে সালাম করেছেন, সে ভাসানী সাহেব জমিদার প্রথা উৎখাতের আন্দোলন করার সময় বলেছেন, সব জমিদাররা যদি ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ওরফে চান মিয়া সাহেবের

মানুষ ধর্মগ্রন্থ পড়ে যেমন পরিশুদ্ধ হয়, কর্মপ্রেরণা লাভ করে তেমনি নজরুলের কবিতা পড়েও আমরা অনুপ্রাণিত হই। কখনও গতি হারিয়ে নিষ্প্রাণ হয়ে গেলে তাঁর লেখা একটি লাইন পড়লেই আবার প্রাণ ফিরে পায় মানুষ। যেমন আল্লাহর বাণী, তোমরা সংগ্রাম করতে থাকো যতক্ষণ না পর্যন্ত ফেতনা দূরীভূত হয়। বঙ্গবন্ধু বলেছেন, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ্। আর নজরুল বলেছেন,

"মহা-বিদ্রোহী রণক্লান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত।
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না-
বিদ্রোহী রণক্লান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত।"

পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন তাহলে জমিদার প্রথা বিলোপের জন্য আন্দোলন করতাম না (টাঙ্গাইলের হাজার বছরের ইতিহাস, এডভোকেট নুরুল ইসলাম)।

সুলতানী আমলে ২শ' বছর বাংলা স্বাধীন ছিল। এ সময় বাংলাদেশে অনেক বিদেশি পর্যটক এসেছেন। ইবনে বতুতা তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে বলেছেন যে, তখন সাত টাকায় আটাশ মণ ধান পাওয়া যেত। আজ থেকে মাত্র সাড়ে ৩শ' বছর আগে শায়েস্তা খানের আমলে ঢাকায় এক টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। পন্নী পরিবারের পূর্বপুরুষরা কররানি বংশের সুলতান ছিলেন। তাজ খান কররানি, সুলায়মান খান কররানি, বায়াজীদ খান কররানি, দাউদ খান কররানি। ১৫৬৩ থেকে ১৫৭৬ পর্যন্ত তারা পূর্বে আসাম, মেঘালয়, কামরূপ থেকে বর্তমান বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, উত্তর প্রদেশসহ বিরাট ভূখণ্ডের সুলতান ছিলেন। তাদের নামে খোতবা পাঠ হত, তাদের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রায় একদিকে ছিল তাঁদের নাম অপর দিকে কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লেখা থাকত। সেগুলো জাদুঘরে গেলে এখনও দেখতে পাওয়া যায়।

দাউদ খান কররানি যখন মসনদে আসীন ছিলেন তখন বাংলাকে দখল করতে দিল্লীর সম্রাট আকবর সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। তখন সুলতান দাউদ খান বলেছেন, আমরা মস্তক দিব, কিন্তু স্বাধীনতা দিব না। বাংলাপিডিয়া মোতাবেক তিনি ৪০,০০০ অশ্বারোহী, ৩,৬০০ হাতি, ১১,৪০,০০০ পদাতিক ও ২০,০০০ কামানের এক বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন। কিন্তু তাঁর সভাসদের মধ্য থেকেই গাদ্দারি করা হয়েছিল। না হলে তিনিই জয়ী হতেন। বঙ্গবন্ধুর লেখা কারাগারের রোজনামচা বইতে সেই গাদ্দারির প্রসঙ্গ এসেছে। তিনি লিখেছেন, দাউদ কাররানির উজির বিক্রমাদিত্য ও সেনাপতি কাদলু লোহানী বেঈমানী করে মোগলদের দলে যোগদান করে। রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খান কররানিকে পরাজিত বন্দী ও হত্যা করে বাংলাদেশ মোগলদের হাতে তুলে দেয়। মোগলরা কিন্তু সরাসরি বাংলাকে শাসন করতে পারে নি। তারা এই পরিবারেরই সন্তান সাঈদ খান পন্নীকে আতিয়া পরগনার সুবেদার নিয়োগ করেন। তাঁর নির্মিত আতিয়া মসজিদের ছবি আজও আমরা দশটাকার নোটে দেখতে পাই। একসময় মোগল শাসকদের ব্যর্থতার ফল হিসেবে ব্রিটিশরা আমাদেরকে দখল করল।

এরপর বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা স্বাধীন হওয়ার পর তিনি দেশ গঠন শুরু করে দিলেন। এক সময় তিনি কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ভারত থেকে বাংলাদেশে নিয়ে আসলেন চিকিৎসা করানোর জন্য। আমাদের বিদ্রোহী কবি, রেনেসাঁর কবি, সাম্প্রদায়িকতার বিষ দাঁত ভাঙ্গার কবি, তিনি হিন্দু ও মুসলিম গোঁড়াপন্থীদের বিরুদ্ধে সমানতালে কলম চালিয়েছেন। এই কবি যখন অনাদরে অযত্নে ধুঁকে ধুঁকে মারা যাচ্ছিলেন তখন বঙ্গবন্ধু তাঁকে দেশে নিয়ে আসলেন, তাঁকে জাতীয় কবির মর্যাদা প্রদান করলেন। হেযবুত তওহীদের এমামুযযামান বায়াজীদ খান পন্নী তখন উপমহাদেশের প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথ। বঙ্গবন্ধু কবি নজরুলের চিকিৎসার জন্য দেশের শীর্ষ পর্যায়ের চিকিৎসকদের নিয়ে একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করলেন এবং এমামুযযামানকেও সেই বোর্ডে একমাত্র হোমিওপ্যাথ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করলেন। কবি তখন ধানমণ্ডির কবি ভবনে থাকতেন, আবার পিজি হাসপাতালেও ভর্তি ছিলেন। এমামুযযামানের চিকিৎসায় কবির স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হচ্ছিল। কিন্তু ভক্তদের ভিড়ের কারণে কবির পর্যাপ্ত ঘুম হচ্ছিল না। এমামুযযামান এজন্য হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বেশ উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করেন। এমামুযযামান নজরুল ইসলামের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। তিনি মগবাজারে নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং একাডেমীর আজীবন সদস্য ছিলেন। তিনি নিয়মিত নজরুলের গান চর্চা করতেন। এটিএন-এর একটি প্রতিবেদনে নজরুল ইসলামের চিকিৎসায় এমামুযযামানের ভূমিকার কথা উঠে এসেছে, নজরুলের শেষ দিনগুলো নিয়ে যারাই লিখেছেন তারাই এমামুযযামানের কথা গুরুত্বসহকারে লিখেছেন। কবি নজরুল পন্নী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত করটিয়ার সা'দত কলেজে গিয়েছিলেন ১৯৭৪ সালে। তিনি যে স্থানে বসে বিশ্রাম নিয়েছিলেন সেখানে নজরুল কুটির নামে একটি বিশ্রামাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যখন তিনি সুস্থ ছিলেন তখনই করটিয়ার জমিদাররা কীভাবে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণ করছেন সে সম্পর্কে সম্যক জানতেন। তিনি লিখেছিলেন, আমি না দেখলেও জানি করটিয়া সাধারণ বিদ্যাপীঠ নয়। অতীতের আল-আজহার, বোগদাদের স্বপ্ন দেখছে করটিয়া।

আজকে হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের নাম শুনলে অনেকে ভয়ে আতঙ্কে আঁতকে ওঠেন। আসলে সংগঠনটি অপপ্রচারের শিকার হয়েছে। হিজবুত তাহরীর নামের একটি সংগঠনকে উগ্রবাদী কর্মকাণ্ডের দায়ে নিষিদ্ধ করা হয়। তাদের সঙ্গে হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের নামের আংশিক মিল থাকায় অনেক হয়রানি ও অপপ্রচারের শিকার হতে হয় আমাদের। এসব মিলিয়ে এমামুযযামানের আজীবনের কর্মকাণ্ডের কোনো স্বীকৃতি মেলেনি। এমামুযযামান কাজী নজরুল ইসলামের লেখা "আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান কোথা সে মুসলমান" গানটিকে হেযবুত তওহীদের দলীয় সংগীত হিসেবে নির্বাচিত করলেন। হেযবুত তওহীদের ঘরোয়া মিটিং হোক বা যে কোনো মিটিংয়ের শুরুতে এই গানটি শোনা হয়। নজরুলকে আমরা সত্যিকারভাবেই চেতনায় ধারণ করেছি। আর সেই চেতনা হচ্ছে প্রকৃত ইসলামের চেতনা, ধর্মব্যবসা ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে চেতনা, সাম্প্রদায়িকতা ভুলে হিন্দু-মুসলিম সকলে নির্বিশেষে মানুষ সমাজে সম্প্রীতি ও ঐক্যের মাঝে বসবাসের চেতনা, বিপ্লবের চেতনা, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার চেতনা। তিনি ধর্মের নামে গোঁড়ামির বিরুদ্ধে, ধর্মব্যবসার বিরুদ্ধে তুখোড় কবিতা লিখেছেন।

আশিটা বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনি তোমায় কভু,

আমার ক্ষুধার অন্ন তা ব'লে বন্ধ করনি প্রভু।

তব মস্‌জিদ মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবী।

মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবী!

বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ঈদে মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় বলেছিলেন, "ধর্ম নিয়ে আর ব্যবসা করা চলবে না।" এটি ছিল দৈনিক বাংলার বাণী পত্রিকার লিড নিউজ। আজ থেকে অর্ধ শতাব্দী আগের কথা। এমামুযযামান সংগ্রাম করে গেছেন এই ধর্মব্যবসার বিরুদ্ধে। হেযবুত তওহীদের বর্তমান এমাম জনাব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম বই লিখেছেন ধর্মব্যবসার ফাঁদে। বঙ্গবন্ধুর কথা, নজরুলের কবিতা আর এই ধর্মব্যবসার ফাঁদে এই তিনটি বিষয় একসাথে মিলালে দেখা যায় তিনজনের চেতনা একই সূত্রে গাঁথা। বঙ্গবন্ধু বলেছেন বাংলার জমিতে আর ধর্মব্যবসা

চলবে না, কাজী নজরুল ইসলামও একই কথা বলেছেন এবং এমামুযযামান ধর্মব্যবসার বিরুদ্ধে লিখেছেন।

২০২৩ সালে এসে ধর্মব্যবসার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম, নজরুলের চেতনা বাস্তবায়ন করার জন্য লড়াইয়ে নেমেছে হেযবুত তওহীদের সদস্যরা। তাদের মনে প্রাণে, ধ্যানে, জ্ঞানে, সাধনায় সর্বত্র নজরুলের চেতনা। কবি নজরুলের দাড়ি ছিল না, এ নিয়ে তাঁকে মোল্লাদের কটাক্ষ শুনতে হয়েছে। দাড়ি না রেখে তিনি কেন চুল রাখলেন এ নিয়ে তাঁকে এখনও বিদ্রুপ করা হয়। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন দাড়ি, টুপি, লেবাস আর টিকিই ধর্মের সার কথা নয়। ধর্ম অনেক বড় একটি ধারণা। আল্লামা ইকবালও এ কারণেই হয়ত দাড়ি রাখেন নি। তবু তাকে আল্লামা বলা হয়, তার ধর্ম সম্পর্কে শুদ্ধ জ্ঞানচর্চার কারণে। কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে এত গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, তবু তাকে কাফের ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। মূলত কাউকে যদি আল্লামা বলতে হয় তাহলে কাজী নজরুল ইসলামকে বলা উচিত আল্লামা কাজী নজরুল ইসলাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

বঙ্গবন্ধু যখন স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন তখন অসংখ্য নারী পুরুষ অস্ত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে কিন্তু এখন তো সরকার আছে। তাই হেযবুত তওহীদের সদস্যরা অস্ত্র হাতে না নিয়ে কলম হাতে নিয়েছে। প্রথমে তারা পত্রিকার মাধ্যমে শুরু করে প্রকৃত ইসলামের অদর্শ তুলে ধরা। তারা তুলে ধরে ইসলামে নারীর প্রকৃত অবস্থান। আল্লাহর রসুল নারীদেরকে কী কী কাজে লাগিয়েছেন, ইসলামের সুমহান বিজয় ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠায় তাদের অবদান কী ছিল ইত্যাদি। নজরুলের ভাষায়, নারীর অবদান ছিল অর্ধেক।

কোন কালে একা হয়নি কো জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়লক্ষ্মী নারী।

মানুষ ধর্মগ্রন্থ পড়ে যেমন পরিশুদ্ধ হয়, কর্মপ্রেরণা লাভ করে তেমনি নজরুলের কবিতা পড়েও আমরা অনুপ্রাণিত হই। কখনও গতি হারিয়ে নিস্প্রাণ হয়ে গেলে তাঁর লেখা একটি লাইন পড়লেই আবার প্রাণ ফিরে পায় মানুষ। যেমন আল্লাহর বাণী, তোমরা সংগ্রাম করতে থাকো যতক্ষণ না পর্যন্ত ফেতনা দূরীভূত হয়। বঙ্গবন্ধু বলেছেন, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ্। আর নজরুল বলেছেন,

"মহা-বিদ্রোহী রণক্লান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত।
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না-
বিদ্রোহী রণক্লান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত।"

আল্লাহর বাণী এবং রসুলের বাণী শুনে মানুষ যেভাবে অনুপ্রাণিত হয়, সেভাবে নজরুলের কথা শুনেও অনুপ্রাণিত হয়।

কাজেই বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীন করেছেন, সংগ্রাম করেছেন, আজকে বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংগ্রাম করছেন, কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদেরকে চেতনা দিয়ে গিয়েছেন। এই সমস্ত কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে যদি সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মব্যবসা, ধর্মের নামে গুজব, হুজুগ, অপরাজনীতি বন্ধ করা না হয়। এগুলোর বিরুদ্ধে সবাইকে এক হয়ে সংগ্রাম করতে হবে। নাহলে আমাদের স্বাধীনতাসহ সকল অর্জন ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলার মাটিকে আমরা আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া হতে দেব না ইনশাল্লাহ।

সকল মানুষ ভাই ভাই হতে বাধা কোথায়?

রিয়াদুল হাসান

আল্লাহ আখেরি নবী মোহাম্মদের (দ.) পূর্বে যুগে যুগে পৃথিবীর প্রতি জনপদে তাঁর বার্তাবাহক প্রেরণ করেছেন। তাঁদের প্রতি সংশ্লিষ্ট মানবগোষ্ঠীর ভাষায় নাজেল করেছেন ঐশী গ্রন্থ। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নবীগণের জীবনাবসানের পর তাঁর অনুসারীরা সেই ধর্মের শিক্ষার অতি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে কায়েমী স্বার্থরক্ষায় ধর্মকে ব্যবহার করতে গিয়ে সেগুলিকে বিকৃত করে ফেলেছে। এমন কি ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যেও নিজেদের মনগড়া কথা ঢুকিয়ে দিয়েছে। ব্যতিক্রম হচ্ছে শেষ গ্রন্থ আল কোর'আন। এর সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ নিজে নেওয়ায় (সুরা হিজর ৯) ১৪০০ বছর পরেও এটি সম্পূর্ণ অবিকৃত আছে। তবে কোর'আনকে বিকৃত করতে না পারলেও কোর'আন এবং হাদিসের বিকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে দীনের উদ্দেশ্য এবং প্রতিটি বিষয়ের ধারণাই পাল্টে দেওয়া হয়েছে।

প্রচলিত ধর্মগুলির বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করলে, তাদের গ্রন্থগুলি নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণী মন নিয়ে পড়লে বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, প্রধান প্রধান সকল ধর্মের প্রবর্তকগণ যে একই স্রষ্টার প্রতিনিধি, একই শিক্ষার প্রচারক, তাঁদের আনীত গ্রন্থাদিও সেই অভিন্ন স্রষ্টার নাজেলকৃত, এবং সব ধর্মগুলি যেন একই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা। বর্তমানেও সেগুলির মর্মবাণী ও বিধি-বিধানে অনেক মিল রয়েছে, কারণ আদিতে, ধারণাগতভাবে সবই এক ও অভিন্ন। আজকে জাতিতে জাতিতে যে বিভেদ সেটা দূর করতে হলে আমাদেরকে সেই আদিতে ফিরে তাকাতে হবে। তাহলে আমরা দেখতে পাবো, আজকের এই সহিংসতা ও বিদ্বেষ অনর্থক।

বর্তমানে প্রতিটি ধর্মের অনুসারীরা মনে করেন স্রষ্টা কেবল আমাদের সাথেই আছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো বর্তমানে আমরা যেভাবে সাম্প্রদায়িক হানাহানি, বিদ্বেষ, উগ্রবাদ, আতঙ্ক ও দাঙ্গার বিভীষিকা বিস্তার করি, তাতে স্রষ্টা আমাদের কারও প্রতিই খুশি হবেন না। বরং এটা নিশ্চিত করে বলা যায়, মানুষে মানুষে বিভেদের প্রাচীর তৈরি করে এবং মানবতাকে উপেক্ষা করে আমরা স্রষ্টার অভিশাপ ক্রয় করে নিয়েছি। এ অভিশাপ থেকে বাঁচার একটি মাত্র উপায় আছে। সেটা হলো, সকল ধর্মের অনুসারীকেই এটা উপলব্ধি করা যে তারা সকলেই এক পিতা-মাতার সন্তান, তারা ভাই-ভাই।

একটি অনুষ্ঠানে মাননীয় এমামের বক্তব্য শুনে একজন সনাতনধর্মী আবেগ-আপ্লুত হয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

আজকের পৃথিবীতে প্রধান প্রধান ধর্মীয় জাতিগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে যতগুলো অমিল লক্ষ করা যায়, তার চেয়ে মিল দেখা যায় বহুগুণ বেশি। অথচ রাজনৈতিকসহ বিভিন্ন কারণে জাতিগুলোর অমিল বা মতদ্বৈততা আছে এমন বিষয়গুলোকেই বারংবার সামনে আনা হয়, আর মিলগুলোকে সুচতুরভাবে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। ধর্মব্যবসায়ী ও স্বার্থবাদী রাজনীতিকদের এই কপটতার বলি হয় সকল ধর্মের সাধারণ মানুষেরা। তাই ধর্মব্যবসায়ীরা যাতে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সাধারণ মানুষকে প্ররোচিত করে কোনোরূপ অনর্থ ঘটাতে না পারে সেজন্য সকল ধর্মসম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় অতি প্রয়োজনীয়।

সনাতন ও মুসলিমদের আন্তঃসম্পর্ক কী

এ উপমহাদেশসহ সারা বিশ্বে প্রায় ১১০ কোটি সনাতন ধর্মের অনুসারী রয়েছেন। ধর্মীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ধর্মগ্রন্থের প্রাচুর্যের দরুন এ সম্প্রদায়টি বরাবরই ধর্মানুরাগী হিসেবে পরিচিতি পেয়ে এসেছে। গবেষকদের মতে পৃথিবীতে বিরাজিত প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ বেদের ধারক এই সনাতন ধর্মাবলম্বীরা। বহু অবতারের আগমন ঘটেছে এই ভারতবর্ষে যারা সকলেই ছিলেন সনাতন ধর্মের প্রচারক। সনাতন শব্দের অর্থ যা নিত্য, চিরসত্য, স্বতঃসিদ্ধ, শাশ্বত। আল কোর'আনে ইসলামকে বলা হয়েছে 'দীনুল কাইয়্যেমাহ'। এই 'কাইয়্যেমাহ' শব্দের অর্থও ঐ একই- যা সনাতন, নিত্য, শাশ্বত। সে হিসেবে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা আর মুসলিমরা এতটা নিকটবর্তী যে, তাদের উভয়ের ধর্মের বৈশিষ্ট্যসূচক নাম পর্যন্ত অভিন্ন। এই এলাকার মানুষের ধর্মকে হিন্দু ধর্ম কখনোই বলা হতো না। Hinduism শব্দটি প্রথম ব্যবহার করে ব্রিটিশরা। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ২০শ খণ্ডের ৫১৯ পৃষ্ঠায় Hinduism অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "The term Hinduism ... [was] introduced in about 1830 by British writers."

হিন্দু কাকে বলে? ইতিহাস থেকে জানা যায়, সিন্ধু নদের অববাহিকা (Indus Vally) অঞ্চলকে হিন্দ ও হিন্দুস্তান বলে ডাকত পারস্যের মুসলিমরা। এটি ছিল একটি ভৌগোলিক পরিচয়, ধর্মীয় পরিচয় নয়। পরবর্তীতে এ ভূখণ্ডের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মটাও সেই কারণে হিন্দু ধর্ম (Indian religion) বলে আখ্যা পেয়ে যায়। বস্তুত সিন্ধুনদের অববাহিকায় বসবাসকারী সকলেরই ভৌগোলিক পরিচয়- তারা হিন্দু। উইকিপিডিয়ার বর্ণনায়- Historically, the term 'Hindu' has also been

used as a geographical, cultural, and later religious identifier for people living in the Indian subcontinent.

যেহেতু সকল মানুষ একই পিতামাতা আদম হাওয়ার সন্তান, সেহেতু সকল মানুষ ভাই-ভাই। সনাতন ধর্মের ভবিষ্যপুরাণ গ্রন্থে আদি পিতামাতাকে আদম ও হব্যবতী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, "আদমকে প্রভু বিষ্ণু কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করেন। তারপর তারা কলির প্ররোচনায় নিষিদ্ধ রম্যফল ভক্ষণ করে স্বর্গ থেকে বহিষ্কৃত হন।" কোর'আন ও বাইবেলের বর্ণনাও প্রায় একই।

সনাতন ধর্মাবলম্বীরা প্রাথমিকভাবে মহর্ষী মনুর অনুসারী। কোনো কোনো গবেষকের মতে মহর্ষী মনুই হচ্ছেন কোর'আনে বর্ণিত নুহ (আ.)। নুহ (আ.) এর প্রচারিত ধর্ম যে 'ইসলাম'-ই ছিল এবং তাঁর অনুসারীরা যে 'মুসলিম' ছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নুহ (আ.) এর মাধ্যমেই মানবজাতির বংশরক্ষিত হয়, তাই পৃথিবীতে বিরাজমান সকল মানুষের পূর্বপুরুষ একসময় নূহের (আ.) অনুসারী ছিলেন। এজন্য তাঁকে দ্বিতীয় আদমও বলা হয়। পরবর্তীতে ভারতবাসীকে পথ দেখাতে আবির্ভূত হয়েছেন আরও বহু পথপ্রদর্শক যাঁদেরকে ভারতীয় ভাষায় বলা হয় অবতার। বহু মুসলিম গবেষক মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণ, গৌতম বুদ্ধ, মহাবীর প্রমুখ ধর্ম প্রবর্তকগণ সকলেই ঈশ্বরের প্রেরিত হতে পারেন। তবে তাদের শিক্ষা কালের পরিক্রমায় বিকৃত হয়ে গেছে। তবু তাঁদের কাউকে অবজ্ঞা করা, অবমাননা করা মুসলমানদের জন্য অনুচিত।

সনাতন ধর্মের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্যগত মিলগুলো নিয়ে যদি কেউ চিন্তা ও গবেষণা করেন তাহলে বিস্মিত না হয়ে পারবেন না। আমরা যেমন একজন স্রষ্টায় বিশ্বাস করি তেমনিভাবে সনাতন ধর্মেও একেশ্বরবাদের ধারণাই প্রচারিত হয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে, একমেবাদ্বিতীয়ম। পরম বক্ষ একজন- একমব্রক্ষ দ্বৈত্ব নাস্তি। দ্বিতীয় কেউ নেই, লা শরিক। ইসলামের ধারণামতে সৃষ্টিজগৎকে নিয়ন্ত্রণের জন্য অগণিত মালায়েক বা ফেরেশতা দায়িত্বপালন করছে। ঠিক একইভাবে সনাতন ধর্মেও আছে দেবদেবীর ধারণা যারা কেউ আগুনের দেবতা (অগ্নি), কেউ পানির দেবতা (বরুণ), কেউ বাতাসের দেবতা (পবন), কেউ ভাগ্যের দেবী (লক্ষ্মী), কেউ যুদ্ধের দেবী (দুর্গা/কালী), কেউ মৃত্যু দেবতা (যমদূত)। দুই ধর্মেই ইহকাল পরকাল, জান্নাত জাহান্নাম, তীর্থগমন, জিকির আজকার - যপতপ, রোজা-উপবাস, কোরবানি-পশুবলি ইত্যাদি বহু বিষয়ে মিল রয়েছে। আরো মিল রয়েছে ধর্মীয় আদেশ নিষেধ, হালাল-হারামের ধারণায়। যেমন- মদ্যপান, জুয়া, ব্যভিচার, সুদ, ঘুষ, ধর্মব্যবসা ইত্যাদি উভয় ধর্মেই কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

খ্রিস্টান ও মুসলমানের আন্তঃসম্পর্ক কী

খ্রিস্টানদের সাথে মুসলিমদের মানসিক দূরত্বের পেছনে রাজনৈতিক স্বার্থবাদীদের চক্রান্তই প্রধান হলেও ধর্মীয় বিশ্বাসের তারতম্যও যথেষ্ট বিবেচনার দাবি রাখে। খ্রিষ্টধর্মের প্রবক্তা যিশু তথা ঈসাকে (আ.) মুসলিমরা রসুল বলে বিশ্বাস করে, কাজেই তিনি যে শিক্ষা প্রচার করেছিলেন নিঃসন্দেহে তা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক কিছু হতে পারে না। ঈসা (আ.) ত্রিত্ববাদের শিক্ষা দেননি, তিনি তওহীদের শিক্ষাই দিয়েছেন। বাইবেলে আমরা পাই, একদিন একজন লোক তাঁর কাছে জানতে চাইলো, সকল অনুশাসনের (commandment) মধ্যে সর্বপ্রথম অনুশাসন কি? ঈসা (আ.) উত্তরে বললেন, "শোন হে বনি ইসরাইল- সর্বপ্রথম অনুশাসন হচ্ছে আমাদের প্রভু আল্লাহ হচ্ছেন একমাত্র প্রভু "The first of all the commandments is, Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord." (The 12th chapter of Mark) মুসলিমদের বিশ্বাসও তাই আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। বাইবেল বলছে, যিশু খ্রিস্ট আবার আসবেন এবং এন্টি ক্রাইস্ট ধ্বংস করবেন, শেষনবীর হাদিসেও বলা আছে তিনি আবার আসবেন এবং এসে দাজ্জাল ধ্বংস করবেন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন।

পবিত্র কোর'আনে ঈসা (আ.) সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে, গ্রন্থধারীদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তার মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না (সুরা নিসা ১৫৯)। সুতরাং গ্রন্থধারী জাতি হিসাবে সনাতন, ইহুদি, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ইত্যাদি সবাই তাঁর উপর ঈমান আনবে অর্থাৎ এরা সবাই তওহীদের অনুসরণকারী এক জাতিতে পরিণত হবে।

নবী-রসুলগণ কোনো নির্দিষ্ট জাতির একার সম্পদ হতে পারেন না। তাঁরা সমগ্র পৃথিবীর সম্পদ, সমগ্র মানবজাতির সম্পদ। তাঁরা যে বিধান এনেছেন স্থান-কাল-পাত্রভেদে সেগুলোতে কিছু রদ-বদল থাকলেও মূল শিক্ষায় কোনো পার্থক্য ছিল না। পৃথিবীর সত্য, শাশ্বত, সনাতন নিয়ম-নীতির কোনো পরিবর্তন হয় না। এই শাশ্বত শিক্ষা যেমন কোর'আনে আছে, তেমন বাইবেলেও আছে, যদিও কেবল কোর'আনকেই আল্লাহ স্বয়ং সংরক্ষণ করছেন, কেননা এটাই শেষ আসমানী কেতাব, কেয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী আসবেন না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে কার্যত কোনো হিংসা, বিদ্বেষ, যুদ্ধ, হানাহানি তথা শত্রুতার যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ নেই।

ঈসা (আ.) শেষ নবীকে কতখানি সম্মান করেছেন তা বাইবেলে বর্ণিত আছে। ঈসা (আ.) তাঁর আসহাবদেরকে

বলেছেন, "বিশ্বাস করো আমি তাঁকে দেখেছি এবং তাঁকে সম্মান জানিয়েছি। এভাবে সকল নবী তাঁকে দেখেছেন। তাঁর রূহকে দর্শনের মাধ্যমে নবীগণ নব্যুয়তপ্রাপ্ত হয়েছেন। আমি যখন তাঁকে দেখলাম আত্মা প্রশান্ত হয়ে গেল। আমি বললাম, "হে মোহাম্মদ! আল্লাহ আপনার সহায় হোন। আমাকে তিনি আপনার জুতার ফিতা বাঁধার যোগ্যতা দান করুন। কারণ আমি যদি এই মর্যাদা লাভ করি তাহলে আমি একজন বড় নবী হবো এবং আল্লাহর একজন পবিত্র মানুষ হয়ে যাবো। (The Gospel of Barnabas, Chapter 44)". এই ছিল একজন নবীর নিকটে অপর একজন নবীর সম্মান, মর্যাদা। অথচ তাদেরই অনুসারী দাবি করে আমরা একে অপরের সাথে শত্রুতা করে যাচ্ছি, উপাসনালয় ভাঙছি, দাঙ্গা করছি, রক্তপাত করছি।

অভিযোগ করা হয়ে থাকে কোর'আনে নাকি বহু আয়াত আছে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে। এটা একটা বিভ্রান্তি। বস্তুত কোর'আনে খ্রিস্টানদের ব্যাপারে বলা আছে- তুমি অবশ্যই মো'মেনদের জন্য মানুষের মধ্যে শত্রুতায় অধিক কঠোর পাবে ইহুদি ও মুশরিকদেরকে। আর মো'মেনদের জন্য বন্ধুত্বে তাদেরকে নিকটে পাবে যারা বলে, 'আমরা নাসারা (খ্রিস্টান)' (মায়েদা, ৮২)।

নাজ্জাশী ছিলেন খ্রিস্টান শাসক। তিনি রসুলাল্লাহকে সত্য প্রচারে সহযোগিতা করেছিলেন। তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন তাবুক যুদ্ধের পর নবম হিজরীতে। আল্লাহর রসুল নাজ্জাশীর এন্তেকালের তারিখেই তার মৃত্যু সংবাদ সাহাবাদের জানান এবং জামায়াতবদ্ধ হয়ে গায়েবানা জানাযার ব্যবস্থা করেন। তিনি বলেন- 'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জানাযা পড় যিনি অন্য দেশে মৃত্যুবরণ করেছেন।' রসুলাল্লাহ যখন জানাযায় দাঁড়ালেন তখন কয়েকজন মুনাফেক মন্তব্য করে যে, রসুলাল্লাহ একজন কাফেরের জানাযা পড়াচ্ছেন। এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ সুরা আল ইমরানের ১৯৯ নং আয়াত নাজেল করলেন, যেখানে বলা হয়েছে- 'আর আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং যা কিছু তোমার উপর অবতীর্ণ হয় আর যা কিছু তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোর উপর, আল্লাহর সামনে বিনয়াবনত থাকে এবং আল্লাহর আয়াতসমুহকে স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে সওদা করে না, তারাই হলো সে লোক যাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে তাদের পালনকর্তার নিকট।'

পরবর্তীতে খ্রিস্টানদের সাথে মুসলিমদের যে যুদ্ধের ইতিহাস পাওয়া যায় তার প্রধান কারণ ছিল রাজনৈতিক। পবিত্র জেরুজালেম শহর মুসলিম বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করার পর খলিফা ওমর বিন খাত্তাব (রা.) ঘুরে ঘুরে শহরের দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখার সময় যখন খ্রিস্টানদের একটি অতি প্রসিদ্ধ গির্জা দেখছিলেন তখন সালাতের সময় হওয়ায় তিনি গির্জার বাইরে যেতে চাইলেন। জেরুজালেম তখন সবেমাত্র মুসলিমদের অধিকারে এসেছে, তখনও কোন মসজিদ তৈরিই হয় নি, কাজেই সালাহ খোলা ময়দানেই কায়েম করা হতো। জেরুজালেমের প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ বিশপ সোফ্রোনিয়াস ওমরকে (রা.) অনুরোধ করলেন ঐ গির্জার মধ্যেই তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে নামাজ পড়তে। ভদ্রভাবে ঐ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে ওমর (রা.) গির্জার বাইরে যেয়ে সালাহ কায়েম করলেন। কারণ কি বললেন তা লক্ষ্য করুন। বললেন- আমি যদি ঐ গির্জার মধ্যে নামাজ পড়তাম তবে ভবিষ্যতে মুসলিমরা সম্ভবতঃ একে মসজিদে পরিণত করে ফেলত। একদিকে ইসলামকে পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠিত করতে সর্বস্ব পণ করে দেশ থেকে বেরিয়ে সুদূর জেরুজালেমে যেয়ে সেখানে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা, অন্যদিকে খ্রিস্টানদের গির্জা যেন কোন অজুহাতে মুসলিমরা মসজিদে পরিণত না করে সে জন্য অমন সাবধানতা। উম্মতে মোহাম্মদী যতো যুদ্ধ করেছিল সেগুলির উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় জীবনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু তারা ব্যক্তিগতভাবে একটি মানুষকেও তার ধর্ম ত্যাগ করে এই দীন গ্রহণে বাধ্য করেন নি।

শুধু তাই নয়, যেখানেই তারা আল্লাহর দেওয়া দীনুল হক প্রতিষ্ঠা করেছেন সেখানেই অন্য ধর্মের চার্চ, সিনাগগ, মন্দির ও প্যাগোডা রক্ষার দায়িত্ব তো নিয়েছেনই তার উপর ঐ সব ধর্মের লোকজনের যার যার ধর্ম পালনে কেউ যেন কোনো অসুবিধা পর্যন্ত না করতে পারে সে দায়িত্বও তারা নিয়েছেন। একটি উদাহরণ দিই। আমর ইবনুল আস (রা.) এর মিশর বিজয়ের পর আলেকজান্দ্রিয়ায় কে একজন একদিন রাত্রে যীশু খ্রীস্টের প্রস্তর নির্মিত প্রতিমূর্তির নাক ভেঙ্গে ফেলেছে। খ্রিস্টানরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তারা ধরে নিল যে, এটা একজন মুসলিমেরই কাজ। আমর (রা.) সব শুনে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তিনি প্রতিমূর্তিটি সম্পূর্ণ নতুন করে তৈরি করে দিতে চাইলেন। কিন্তু খ্রিস্টান নেতাদের প্রতিশোধ নেবার বাসনা ছিলো অন্যরূপ। তারা বললো, "আমরা চাই আপনাদের নবী মোহাম্মদের (দ:) প্রতিমূর্তি তৈরি করে ঠিক অমনিভাবে তাঁর নাক ভেঙ্গে দেব।"

এ কথা শুনে বারুদের মতো জ্বলে উঠলেন আমর (রা.)। প্রাণপ্রিয় নবীজির প্রতি এত বড় ধৃষ্টতা ও বেয়াদবি দেখে তাঁর ডান হাত তলোয়ার বাটের উপর মুষ্টিবদ্ধ হয়। ভীষণ ক্রোধে তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ নীরব থেকে নিজেকে সংবরণ করে নিয়ে বললেন, "আমার অনুরোধ, এ প্রস্তাব ছাড়া অন্য যে কোন প্রস্তাব করুন আমি তাতে রাজি আছি।" পরদিন খ্রিস্টানরা ও মুসলিমরা বিরাট এক ময়দানে জমায়েত হলো। আমর (রা.) সবার সামনে হাজির হয়ে বিশপকে বললেন, "এদেশ শাসনের দায়িত্ব

আমার। যে অপমান আজ আপনাদের ধর্মের হয়েছে, তাতে আমার শাসন দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়েছে। তাই তরবারি গ্রহণ করুন এবং আপনিই আমার নাক কেটে দিন।" এই কথা বলেই তিনি বিশপকে একখানি তীক্ষ্ণধার তরবারি হাতে দিলেন। জনতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, খ্রিস্টানরা স্তম্ভিত। চারদিকে থমথমে ভাব। সহসা সেই নীরবতা ভঙ্গ করে একজন মুসলিম সৈন্য এলো। চিৎকার করে বললো, "থামুন! আমি ঐ মূর্তির নাক ভেঙ্গেছি। অতএব আমার নাক কাটুন।" বিজিতদের উপরে বিজয়ীদের এই উদারতায় ও ন্যায়বিচারে মুগ্ধ হয়ে সেদিন শত শত খ্রিস্টান ইসলাম কবুল করেছিলেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সহনশীলতা, অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার এই নজির আজ আমাদের মাঝে কোথায়?

সুতরাং উম্মতে মোহাম্মদীর যুদ্ধগুলি ছিল রাজতান্ত্রিক স্বৈরশাসকদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, কোন সম্প্রদায় বিশেষের বিরুদ্ধে নয়। খ্রিস্টান শাসকরা যুদ্ধগুলোর মধ্যে ধর্মীয় চেতনাকে ব্যবহার করেছেন। মুসা (আ.) যুদ্ধ করেছেন ফেরাউনের বিরুদ্ধে, শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ করেছেন আপন মামা কংস ও কৌরবদের জুলুমের বিরুদ্ধে, ঈসা (আ.) সংগ্রাম করেছেন ইহুদি রাব্বাইদের ধর্মব্যবসার বিরুদ্ধে, আখেরী নবীও যুদ্ধ করেছেন আপন চাচার বিরুদ্ধে। অর্থাৎ বহু নবীকেই যুদ্ধ করতে হয়েছে। কারণ একটাই- অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। রসুলাল্লাহ ও তাঁর প্রকৃত অনুসারীরা মাত্র ৬০/৭০ বছরের মধ্যে অর্ধপৃথিবী অধিকার করেছিলেন। বস্তুত অন্যায়-অবিচার, অশান্তি নির্মূল করে শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এর উদ্দেশ্য, কোনো জাতি বা ধর্মকে আঘাত করা নয়।

বর্তমানে প্রতিটি ধর্মের অনুসারীরা মনে করেন স্রষ্টা কেবল আমাদের সাথেই আছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো বর্তমানে আমরা যেভাবে সাম্প্রদায়িক হানাহানি, বিদ্বেষ, উগ্রবাদ, আতঙ্ক ও দাঙ্গার বিভীষিকা বিস্তার করি, তাতে স্রষ্টা আমাদের কারও প্রতিই খুশি হবেন না। বরং এটা নিশ্চিত করে বলা যায়, মানুষে মানুষে বিভেদের প্রাচীর তৈরি করে এবং মানবতাকে উপেক্ষা করে আমরা স্রষ্টার অভিশাপ ক্রয় করে নিয়েছি। এ অভিশাপ থেকে বাঁচার একটি মাত্র উপায় আছে। সেটা হলো, সকল ধর্মের অনুসারীকেই এটা উপলব্ধি করা যে তারা সকলেই এক পিতা-মাতার সন্তান, তারা ভাই-ভাই। সকল ধর্মই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলে, মানবতার মুক্তির কথা বলে। তাই যার যার ধর্মের মূল শিক্ষাকে ধারণ করলে এবং অন্য ধর্মের মানুষকেও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখলে এই আমাদের ভিতরে থাকা সাম্প্রদায়িক বিভক্তির দেওয়াল অদৃশ্য হয়ে যাবে। সেটাই আমাদের সকলের কাম্য হওয়া উচিত আর সেই শিক্ষাই দেয় ইসলাম।

রাজনৈতিক হানাহানি
ঔপনিবেশিক পাপের উত্তরাধিকার

রিয়াদুল হাসান

দীর্ঘদিন থেকে চলমান রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে আমাদের রোজকার বাজারে। প্রতিটি জিনিসের দাম বেড়েছে দ্বিগুণ, বাড়েনি মানুষের আয়। যুদ্ধ নিয়ে কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব চলছে আমাদের উপমহাদেশেও। একদিকে চিন অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র, মাঝে চিড়েচ্যাপ্টা বাংলাদেশ। ঘনিয়ে আসছে কঠিন দুঃসময়। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় আছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ফলে অস্তিত্বের সংকটে পড়ে গেছে তিনবার সরকার গঠনকারী দল বিএনপি। অতীতের প্রতিটি নির্বাচন আমাদের বলে দেয়, আবারও বাংলাদেশের রাজপথ রক্তে পিচ্ছিল হতে চলেছে। যখন দেশের আকাশে ডানা মেলেছে পরাশক্তিধর শকুন, তখন নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে শকুনের খাদ্যে পরিণত হওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত?

স্বাধীনতার অর্ধ-শতাব্দী পেরিয়ে এসে আমরা আমাদের পেছনে রেখে আসা রাজনৈতিক দিনলিপির দিকে তাকালে এর প্রতি পাতায় কেবল রক্তের দাগ দেখতে পাই। মানুষের রক্তাক্ত লাশ, ক্ষমতার লড়াই, সন্ত্রাসবাহিনীর প্রতিপালন, অস্ত্র আর গোলাবারুদের গন্ধে আমাদের রাজনীতির অঙ্গন কলঙ্কিত। এদেশের মানুষ গণতন্ত্র বলতে বোঝে ভোট, আর ভোট বলতে বোঝে নেতাদের প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি আর রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক জিঘাংসার নগ্নরূপ। আমাদের দেশের রাজনীতির অঙ্গনটিতে কেন কোনো মানবতা বা সভ্যতার ছোঁয়া নেই, কেন এখানে এত সন্ত্রাস, সহিংসতা, দুর্নীতি, পেশীশক্তির দাপট? আসুন ফিরে যাই আরো পিছনে, আমাদের রাজনীতির উৎসমূলে।

এ কথা সকলেই জানেন যে, আমাদের দেশে প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা ব্রিটিশ শাসনামলের উত্তরাধিকার। ১৮৫৭ সনে সংঘটিত সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ পর্যন্ত এই ভারত উপমহাদেশের শাসনকালকে 'ব্রিটিশরাজ' বলা হয়ে থাকে।

আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা এ সময়েই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। যদিও সিপাহী বিদ্রোহেরও একশ বছর আগে থেকেই এদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ রাজত্বই চলে আসছিল, কিন্তু দিল্লির মসনদে আসীন ছিলেন মুঘল বাদশাহগণ, আর বিভিন্ন সুবায় ছিলেন নবাবগণ। যদিও তারা ছিলেন কোম্পানি ও অন্যান্য চক্রান্তকারীদের শিখণ্ডীমাত্র। ১৭৬৫ সালে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দিওয়ানি লাভের মাধ্যমে 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল' হিসাবে কোম্পানির আবির্ভাব ঘটে এবং চূড়ান্ত পতন ঘটে দেশীয় রাজনীতির। সূত্রপাত হয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের। খাজনা আদায় ও ব্যয়ের দায়িত্ব হাতে পেয়েই কোম্পানির লোকেরা অবাধ লুণ্ঠন ও অত্যাচার শুরু করে দেয়। ফলে মাত্র চার বছর যেতে না যেতেই ঘটে যায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, যে মহাদুর্ভিক্ষে প্রায় এক কোটি মানুষ না খেয়ে মারা যায়। জনৈক ইংরেজ কর্মকর্তা রেসিডেন্ট বেচার তার সরকারি পত্রে লিখেন, 'দেশের অনেক জায়গায় সব কিছু খেয়ে শেষ করে এখন মানুষকে মানুষ আক্রমণ করছে ও খাচ্ছে।' (বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো- প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম)।

এরপর ব্রিটিশ শাসকরা এদেশে তাদের শাসনকে চিরস্থায়ী

করতে বহুমুখী ষড়যন্ত্রে মনোনিবেশ করে। বলাবাহুল্য তাদের শাসনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল এদেশের সম্পদ নিজেদের দেশে পাচার করে নিজ দেশকে সমৃদ্ধিশালী করে তোলা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তারা এখানে গোড়া থেকেই ডিভাইড এন্ড রুল নীতি গ্রহণ করেছিল, অর্থাৎ এই ভারতবাসীকে যতভাগে ভাগ করা যায় তত সুবিধা। মুসলিমদের হাত থেকে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিল। তাই মুসলিমরা যেন কোনোভাবে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে না পারে, তার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা হিসাবে তারা ১৭৮১ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার মাধ্যমে একটি বিকৃত বিপরীতমুখী ইসলাম শিক্ষা দিতে শুরু করল। এখানে রাখল না কোনো কর্মমুখী শিক্ষা, ফলে এখান থেকে পাস করে শিক্ষার্থীরা ধর্মকেই পুঁজি করে জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হল। ইউরোপীয় খ্রিস্টান প্রাচ্যবিদগণ তাদের ক্ষুরধার মেধা খাটিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার সিলেবাস ও কারিকুলাম তৈরি করলেন এবং ১৪৬ বছর তারা নিজেরাই অধ্যক্ষপদে থেকে মুসলমানের সন্তানদেরকে ইসলাম শিক্ষা দিলেন। তারা শেখালেন যে একজন মুসলমানের মূল কাজ হচ্ছে আল্লাহর উপাসনা করা তথা নামাজ, রোজা করা, দোয়া-কালাম পাঠ করা, দাড়ি-টুপি রাখা। রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ে তাদের চিন্তা করার দরকার নাই, ওসব দুনিয়াদারীর বিষয় থেকে মুক্ত থেকে ব্যক্তিজীবনে একজন উত্তম মানুষ হওয়াই একজন মুসলমান হিসাবে তার বড় সার্থকতা। মুসলমানদেরকে বিশ্ব-সভ্যতার অঙ্গন থেকে পেছনে ছুঁড়ে ফেলার জন্য মাদ্রাসার সিলেবাসে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, পৌরনীতি, প্রযুক্তি, ভূগোল, শিল্প-সাহিত্য এসব বিষয় অন্তর্ভুক্তই করা হল না। আজও আমাদের মাদ্রাসাগুলো সেই ব্রিটিশ সিলেবাস অনুযায়ী চলছে এবং এখান থেকে যারা বের হয়ে আসছেন তাদের জ্ঞান অজু-গোসলের মাসলা মাসায়েলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

খ্রিষ্টধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের জন্য তারা বহু অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মিশনারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিল। দ্যা চার্টার অ্যাক্ট অফ ১৮১৩ এর মাধ্যমে ঔপনিবেশিক সরকার ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপ নেয়। আর ১৮৩৫ সালে থমাস ব্যাবিংটন ম্যাকলে একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন যা 'দ্য ইংলিশ এডুকেশন অ্যাক্ট অফ ১৮৩৫' নামে ভারতবর্ষসহ অপরাপর ব্রিটিশ উপনিবেশেও প্রবর্তন করা হয়। সেখানে ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে নির্ধারণ করা হয় এবং যেন ভারতীয়রা ব্রিটিশদেরকে দাপ্তরিক, ভূমি বন্দোবস্ত, রাজস্বের হিসাব-নিকাশ ও অন্যান্য স্থানীয় কাজে সহযোগিতা করতে পারে। মূলত হিন্দু জনগোষ্ঠীকে তারা এই শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে চাইল। এজন্য তারা প্রতিষ্ঠা করল হিন্দু কলেজ, সংস্কৃত কলেজ ইত্যাদি। এসব স্কুলে মুসলিম ছাত্রদের পাঠদানে ছিল বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা। ব্রিটিশরা ডিভাইড এন্ড রুল নীতির বাস্তবায়নকল্পে তারা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি সৌহার্দ্যের বন্ধনকে চূর্ণ করে দিতে সদা সচেষ্ট ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে তারা হিন্দু ও মুসলিম জনগোষ্ঠীকে অপরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপ্রবণ করে তুলল আর এই প্রক্রিয়া চলমান ছিল ব্রিটিশ রাজের অবসান না হওয়া পর্যন্ত। প্রাচ্যবিদেরা হাজার হাজার ইসলামবিদ্বেষী বই লিখলেন যা স্কুল কলেজে নিয়ম করে শেখানো হল। সেগুলো অনুবাদ করার জন্য এবং সেগুলোর আলোকে সাহিত্য রচনার জন্য তাদের সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবীরা আত্মনিয়োগ করলেন। মুসলিমরা হিন্দু সমাজ থেকে শিক্ষাদীক্ষায় একশ বছর পিছিয়ে পড়ল। কিছুদিন আগেই যারা ছিল ভারতবর্ষের শাসক তারা হয়ে গেল অসহায় সংখ্যালঘু। এগুলোই ছিল ব্রিটিশ প্রভুদের রাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি।

কিন্তু একটা সময় ইংরেজদের বাইরের সভ্যতার মুখোস খসে বেরিয়ে এলো ভিতরের কদর্য কুৎসিত লোভী দানবের চেহারা। তাদের ও অধিকাংশ জমিদারদের শোষণে শাসনে ত্রাসনে পীড়নে মানুষের নাভিশ্বাস উঠে গেল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, সূর্যাস্ত আইন, কর্নওয়ালিস কোড, নীলকরদের শোষণের বিরুদ্ধে ধাপে ধাপে এদেশের মানুষ অধিকার সচেতন হতে শুরু করল। তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে শুরু করল। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিল মুসলিমরাই এবং সিপাহী বিপ্লবেও তাদের ভূমিকাই ছিল অগ্রগণ্য। ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাসহ সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী এক সুসংগঠিত স্বাধীনতা আন্দোলন তাদের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল। এ আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন সৈয়দ আহমদ বেরেলভি। তিনি মুসলমানদের কাছে আমিরুল মোমেনীন হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তৎকালীন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে শুরু করে মর্দান পর্যন্ত বিশাল অঞ্চলে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন ও ইসলামি শাসনব্যবস্থা চালু করেন।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন নরমপন্থী এবং চরমপন্থী, অহিংস ও বৈপ্লবিক উভয় দর্শনের প্রচেষ্টায় এবং ভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করেছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। ১৮৮৫ সালে ব্রিটিশ অবসরপ্রাপ্ত আইসিএস কর্মকর্তা অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউমের হাত ধরে এই রাজনৈতিক দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর নেতৃত্ব প্রদান করা হয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদাভাই নওরোজীসহ সেই শিক্ষিত শ্রেণিটির হাতে যারা মনেমগজে, চিন্তা-চেতনায় পুরোদস্তুর ইংরেজ। সরকারের সঙ্গে ভারতীয় স্বার্থ নিয়ে দেনদরবারের জন্য এমন লোকদেরকেই

তারা পছন্দ করেছিল। তারা আন্দোলনের নামে মূলত প্রার্থনা, আবেদন-নিবেদন এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে এক মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিল। তারা প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মত ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞেও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থানে যেতে পারেনি। ধর্মনিরপেক্ষ দল হিসাবে কংগ্রেসে মুসলিম পরিবারের অনেকেই ছিলেন, কিন্তু নানাবিধ কারণে বৃহত্তর পশ্চাৎপদ মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষায় তেমন কোনো ভূমিকা রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এর প্রেক্ষিতে কংগ্রেস গঠনের ২১ বছর পর ১৯০৬ সালে ঢাকায় প্রগতিশীল মুসলিম শিক্ষাবিদ সৈয়দ আহমদ উল্লাহ, খাজা নবাব সলিমুল্লাহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ নিখিল ভারত মুসলিম লীগ নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করলেন। করটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (চান মিয়া)-ও এই দলে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

উনিশ শতকের প্রথম ভাগে লালা লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল যাদেরকে একত্রে লাল-বাল-পাল বলা হতো, সেই সঙ্গে শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, মুসলিমদের মধ্যে আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান আল মাশরেকির এর বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপর আরও বেশি প্রভাব বিস্তার করছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ প্রান্তে কংগ্রেস অহিংস আন্দোলনের নীতিমালা অবলম্বন করেছিল এবং অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অথচ দু দুটো বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রায় ৩৫ লক্ষ ভারতীয় সৈনিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে লড়াই করেছে এবং ২ লক্ষাধিক প্রাণ হারিয়েছে, বিশ্বযুদ্ধের ব্যয় যোগাতে না খেয়ে মরেছে কোটি কোটি ভারতীয়। ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় তাদের অনুগত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা অপর্ণ করে যায়। আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলো সেই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগেরই আধুনিক রূপ। তাদের ধমনীতে প্রবাহিত ব্রিটিশ রাজনীতি যেখানে সততার চেয়ে শঠতার কদর বেশি, মানবতার চেয়ে গালভরা কথ ার কদর বেশি। এখানে ধর্মকে ব্যবহার করা হয় ভোটের স্বার্থে, ধর্মের নামে '৪৭ এ ব্রিটিশ প্রভুদের সুরে সুর মিলিয়ে উভয়দল যেমন দেশভাগকে অনিবার্য মনে করেছিল তেমনি এখনও আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিক দলগুলোর কাজের ফলে জাতি আজ বিভক্ত। কোনো জাতীয় স্বার্থ তাদেরকে এক করতে পারে না।

দীর্ঘদিন থেকে চলমান রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে আমাদের রোজকার বাজারে। প্রতিটি জিনিসের দাম বেড়েছে দ্বিগুণ, বাড়েনি মানুষের আয়। যুদ্ধ নিয়ে কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব চলছে আমাদের উপমহাদেশেও। একদিকে চিন অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র, মাঝে চিড়েচ্যাপ্টা বাংলাদেশ। ঘনিয়ে আসছে কঠিন দুঃসময়। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় আছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ফলে অস্তিত্বের সংকটে পড়ে গেছে তিনবার সরকার গঠনকারী দল বিএনপি। অতীতের প্রতিটি নির্বাচন আমাদের বলে দেয়, আবারও বাংলাদেশের রাজপথ রক্তে পিচ্ছিল হতে চলেছে। যখন দেশের আকাশে ডানা মেলেছে পরাশক্তিধর শকুন, তখন নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে শকুনের খাদ্যে পরিণত হওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত? ব্রিটিশদের শেখানো বিভাজনের রাজনীতির শেষ পরিণতি কী হয় তা আমাদের অজানা নয়। আমাদের সামনে আছে সিরিয়া, ইরাক, লিবিয়া, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তানের মত উদাহরণ। তাদের হাতে বিপুল পরিমাণ গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র জমা হয়ে আছে, সেগুলো বিক্রি করার জন্য প্রয়োজন যুদ্ধক্ষেত্র। চিন ও ভারতের নিকটবর্তী হওয়ায় আমাদের এই ভূখণ্ডটি যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও চিন সবার জন্যই লোভনীয়। উপরন্তু আমাদের মাটির নিচে আছে বিপুল খনিজ সম্পদ, আমাদের আছে সতেরো কোটি মানুষের বাজার, আমাদের দেশে আছে দীর্ঘ সমুদ্র উপকূল। সব মিলিয়ে আমাদের দেশটি ছোট হলেও কূটনৈতিক দাবাখেলায় গুরুত্বপূর্ণ ঘুঁটি। আমরা যদি গণতন্ত্রের নামে বিভক্তি টিকিয়ে রাখি আর নিজেরা নিজেরা হানাহানিতে ব্যস্ত থাকি, তাহলে খুব সহজেই আমাদের বহু রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনত, সার্বভৌমত্ব, নিজেদের এক টুকরো মাটি আবারও বিদেশী শক্তির করতলগত হয়ে যাবে। তখন না থাকবে আওয়ামী লীগ, না থাকবে বিএনপি, না থাকবে জামায়াতে ইসলামী, না থাকবে চরমোনাই কিংবা জাতীয় পার্টি। তখন সবাই হব নিজভূমে পরবাসী, আমাদের সোনার বাংলা হবে চিন অথবা যুক্তরাষ্ট্রের বলয়ে অবস্থিত তাদের নব্য উপনিবেশ।

আমাদের সম্পর্কে আমাদের কাছ থেকেই জানুন

উগ্রবাদ নয়
সাম্প্রদায়িকতা নয়
সন্ত্রাস নয়
ধর্মব্যবসা নয়

আসুন, আদম-হাওয়ার সন্তান ভাই-ভাই হয়ে সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে চিরসত্য তওহীদের পক্ষে একটি মহাজাতি গড়ে তুলি।

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম
এমাম, হেযবুত তওহীদ।

যোগাযোগ:

০১৭১১-০০৫০২৫, ০১৬৭০-১৭৪৬৪৩
facebook.com/HezbutTawheedOfficial
hezbuttawheed.org
youtube.com/@hezbuttawheed
htnewsinfo@gmail.com
facebook.com/emamht
youtube.com/@HossainMohammadSalim
facebook.com/emamhezbuttawheed/

হেযবুত তওহীদ
মানবতার কল্যাণে নিবেদিত

যিনি মানবজাতিকে তওহীদের (আল্লাহর সার্বভৌমত্ব) দিকে আহ্বান করেছেন

যিনি বিশ্ববাসীর সামনে ইসলামের প্রকৃত আকিদা তুলে ধরেছেন

যিনি সমস্ত পৃথিবীতে অশান্তির মূল কারণ 'দাজ্জালকে' চিহ্নিত করেছেন

যিনি ধর্মব্যবসা, সন্ত্রাস ও অপরাজনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার

হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা
এমামুয্‌যামান মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

আমরা এমামুয্‌যামানের অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত

সেই মহাপুরুষকে জানতে, তাঁর লেখা বইসমূহ পড়তে ভিজিট করুন: HEZBUTTAWHEED.ORG